# টাইরোসিনিক গপ্পো

## প্রারাম্ভিক গপ্পো

ঠান্ডা মানুষ প্রভাতদা মনে হল ক্ষেপে গেলেন, বললেন,
-বাংলাদেশের মানুষের এই এক সমস্যা। কথা নেই বার্তা নেই নামের লেজ ধরে মানুষের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা। আমার নামের সাথে আমি কোন দেশের বা কোন ধর্মের সেটা লেখা থাকতে হবে কেন। আপনার পুরো নামটা কি শুনি।
আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উত্তর দিলাম,
-আজিজুস সামাদ আজাদ ডন।

প্রভাতদা বললেন,
-আমাকে এখন বলুন, আপনার নাম শুনে আমার পক্ষে কি বলা সম্ভব আপনি কোন দেশের বা ধর্মের। আপনার জগাখিচুড়ি মার্কা নাম ধরে প্রথম যেটা বলতে পারি, আপনার ভবিষ্যত পরিচিতি হিসেবে নামকরণে যারা ভূমিকা রেখেছিলেন তারা এতো কিছু ভাবেননি। আজাদ শব্দটি ফারসি, সুতরাং, আপনি পারসিক ধর্মাবলম্বি হতে পারেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই আপনি পারস্যের হতে পারেন। সামনে আরবী নামের ছোঁয়া থাকায় আপনি আরবের হতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে আপনার মুসলমান হবার সম্ভবনা আছে কিন্তু ডন শব্দটি আপনার খ্রিষ্টান হবার সম্ভবনা বাড়িয়ে তুলেছে এবং একই সাথে আপনাকে ইটালিয়ান, বৃটিশ থেকে শুরু করে সার্বজনীন করে তুলেছে।

আমার ছোট ভাই আতিক এতোক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল, সে বললো,
-ডন ভাইয়ের নামকরণের ডন অংশটি কিন্তু পারিবারিক নাম, রাশিয়ান লেখক মিখাইল শোলকভের লেখা “এন্ড কোয়াইট ফ্লোজ দা ডন” উপন্যাস থেকে নেয়া এবং নামের ইংরেজি বানান Dawn হবার কারণে আপনার নামের সাথে মিল আছে, প্রভাত।

প্রভাতদা বললেন,
-বাহ, ভালইতো, এক সন্ধ্যায় দুই প্রভাত। দিনের আলোর শুরুর আগের আর শেষের পরের লগ্নের এতো টয়লাইট আজ এখানে এক সন্ধ্যাতে মিলিত হয়েছে, আমাদের আজকের সন্ধ্যাটাকে তাহলে বলতে হয় ট্রিপল টয়লাইট। আপনি তো আবার যে কোন আলোচনা লিখে ফেলেন। আমাদের আজকের আলোচনার নামকরণটা আমিই ঠিক করে দিলাম।

আমি এতোসব কথায় কান না দিয়ে বললাম,
-তারমানে কি আপনি একটা মানুষের ধর্ম বা জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করেন না।
প্রভাতদা বললেন,
-অবশ্যই স্বীকার করি। আমি এই মহাবিশ্বের বাসিন্দা, হয়তো বা মাল্টিভার্সের। আর ধর্ম? আমি একাত্ববাদে বিশ্বাসী। আপাত দৃষ্টিতে যাদের একাত্ববাদী মনে হচ্ছেনা তারাও একক শক্তিকে খুঁজে চলেছে, কেউ তেত্রিশ কোটির মাঝে একক শক্তি খুঁজে চলেছে আবার কেউ এককে তেত্রিশ কোটিতে নিয়ে চলেছে।

আজকের সন্ধ্যার এই আলোচনা সভার পেছনের গল্প কিছুটা বলা যাক। আমার ছোট ভাই আতিক জেনেভায় থাকে বিগত প্রায় ত্রিশ বছর, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর বিশাল এক কর্মকর্তা। এই ত্রিশ বছরে সে ত্রিশ দিনও বাংলাদেশে ছিল কিনা সন্দেহ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতিতে বর্তমানে দেশের সাথে তার কিছুটা যোগাযোগ বেড়েছে, সেই সাথে আমার সাথেও। আমার লেখাগুলো আতিক পড়ে। একদিন ফোন করে বললো, আমার "সার্ন" দেখার ইচ্ছে আছে কিনা। বিজ্ঞান নিয়ে যদি কারো নুন্যতম আগ্রহ থেকে থাকে তবে জেনেভা কেন্দ্রীক ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড বিস্তৃত মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ এই সাইন্টিফিক প্রকল্প দেখার আগ্রহ থাকবে না এটা হতেই পারেনা। আমার আগ্রহ আছে জানার পর বলল, আমার স্যাটারডে ক্লাব সংক্রান্ত লেখা গুলো পড়েছেন সার্নের এক বাঙ্গালী সাইন্টিস্ট প্রভাতদা এবং আমাকে সার্ন দেখাবার প্রস্তাব করেছেন। সেই সুত্রে আতিকের আতিথেয়তায় জেনেভায় এসে আজ শনিবার সন্ধ্যায় সান্ধ্যভোজে এক সাথে বসেছি। ভোজের চেয়ে কথাই চলছে বেশী। আড্ডার ধরনেই বুঝে নিয়েছি কেন স্যাটারডে ক্লাবের লেখাগুলো ওনার ভাল লেগেছে, লাগাম ছাড়া দিগ্বিজয়ী কথাবার্তা সব।

প্রভাতদা এমনিতে বেশ ঠান্ডা মেজাজের মানুষ বলেই মনে হয়েছে। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। জ্ঞ্যানের চাপে কিছুটা নুয়ে পরায় জ্ঞ্যান এবং বয়সের মাঝে পার্থক্য করাটাও কঠিন। তবে একই প্রসঙ্গে দু'বারের বেশী তৃতীয়বার প্ররোচিত করলে একটু রেগেই যান বলে মনে হয়েছে। আমি আর নাম দিয়ে কাম কি ধরণের মনভাব নিয়ে বললাম,
-বুঝলাম আপনি বাঁধনহীন এবং একাত্ববাদী কিন্ত আপনি মহাজগতের কোন অঞ্চলের সেটা বলতে অসুবিধা কি।

প্রভাতদা আজকের সন্ধ্যায় এই প্রথম একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন,
-মাল্টিভার্সের অঞ্চল বললে তো এই মহাজগতের পৃথিবী পর্যন্ত এসেই আটকে যাবে। আসলে সৃষ্টিজ্ঞ্যান ছাড়া বিজ্ঞান অপ্রয়োজনীয়। সৃষ্টির মূলে পৌঁছালে দেখবেন বিজ্ঞানের সকল শাখাই এক যায়গায় এসে সমবেত হয়েছে। ঠিক তেমনি সঠিক ইতিহাস জ্ঞ্যান থাকলে রাজনৈতিক বিভক্তি আসবে না। আপনি কি বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানেন।

তার এই কথাটা আমার অহংবোধে বোধহয় কিছুটা আঘাত করলো। আমি বললাম,
-জানবোনা কেন। আমার পিতা বাংলা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের স্বাধীনতা অন্দোলন, এমনকি দেশীয় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মুখের ভেতর থাকা স্যুপের চামচাটা নামিয়ে মাথা না তুলেই চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে সেকেন্ড তিনেক আমাকে গভীর পর্যবেক্ষন করে প্রভাতদা বললেন,
-সবই তো দেখছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক কথা বললেন। আপনি কি জানেন আপনার সাথে আমার কথা বলার ইচ্ছে কেন ছিল।

আমি না সূচক মাথা নাড়াতেই বললেন,
-আপনি জেনেভা ছাড়ার আগে, আপনাকে আমার একটি লেখা দেবো, আপনার কোন একটা লেখার সাথে জুড়ে দেবেন সেই অনুরোধ জানাবার জন্য।

আমি বেশ অবাক। বললাম,
-আপনার লেখা আমার মাধ্যমে কেন।

প্রভাতদাকে আজ সন্ধ্যায় এই প্রথম একটু সংকোচ বোধে ভুগতে দেখলাম। বললেন,
-আমি বিজ্ঞান নিয়ে আছি। আপনার ভাই আতিককে লেখাটি দিতে চেয়েছিলাম। পরে আপনার লেখা পড়ে মনে হল আপনিই বেস্ট চয়েস। যাক, যেটা বলছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আইনস্টাইনের সংযোগ ইতিহাস আপনার কি জানা আছে।

আমি বেশ বিস্ময় নিয়েই "না" বলাতে প্রভাতদা বললেন,
-দেখুন তো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক আপনার বাবাকে নিয়ে কত কথা বললেন অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতো বড় একটা ইতিহাস আপনার জানা ছিল না। সার্নে এসেছেন, সার্ন সম্পর্কে কিছু পড়ালেখা করে এসেছেন বলে ধরেই নিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে সে আশায় গুড়ে বালি।

নাতি-খাতি বেলা তো আর কম হয়নি, আজকাল মেজাজ একটুতেই খারাপ হ'য়ে যায়। বললাম,
-আমি এসেছি ভাইয়ের সাথে কিছু সময় কাটাতে। সার্ন এবং আপনি সেখানে ফাও।

প্রভাতদা পরিবেশ হালকা করার জন্যই বোধহয় খোঁচাটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন,
-আতিক, ভাইয়ের দিকে একটু খেয়াল রেখো, শেষে মূল ফেলে ফাও নিয়ে পরে থাকলে ঝামেলা। আপনার যদি "সার্ন" সম্পর্কে সামান্যও জানা থাকে তাহলে এটাও জানা উচিৎ যে, বাংলাদেশের বিজ্ঞান জগতের ঐতিহাসিক নাম, মুন্সিগঞ্জের পোলা স্যার জগদ্বীশ চন্দ্র বসুর ছাত্র সত্যেন বসুর অংকের সূত্র ধরে হিগস সাহেব যে হিগস বোসন কণার ধারনা তৈরী করেছিলেন, সে কারণেই পৃথিবীজুড়ে কোলায়ডার তৈরীর ধুম পরে গিয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই সার্নের আবির্ভাব। “হিগস বোসন” কণিকার “বোসন” নামটা কিন্তু সত্যেন বোসের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেই জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আতিক বললো,
-দাদা, আপনার সাথে আমার কথা বলতে ভয় লাগে, কখন কোন কথায় আঁতেল মানুষের আঁতে লাগবে বুঝিনা। সার্নের গল্প না শুনিয়ে আইনস্টাইনের কথা শোনাচ্ছেন।
প্রভাতদা খেতে খেতেই বললেন,
-আমি সার্নের মানুষ, সার্ন নিয়ে তো কথা বলবোই। তবে আমার মনে হয় আতিক বাংলাদেশে অনেকদিন যায় না। আজকাল বাংলা ভাষায় আঁতেল শব্দটা যে খোঁচাবার জন্য ব্যবহার করা হয় সেটাই জানে না।

আতিক বোধহয় আমাদের বংশীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা জেনেভাতে প্রতিষ্ঠিত করার নেশায় খাবারের প্লেট থেকে তার দৃষ্টি সরাতে চাইছে না। খেতে খেতেই বললো,
-দেশে কম যাওয়া পরে ঠিক কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সাথে পরিচয়ের গভীরতা বেশী থাকায় বেশ চালিয়ে নিচ্ছি। তাছাড়া বাংলা ভাষায় আঁতেলের বিকৃত ব্যবহার বহু পুরনো, আমি দেশে থাকা অবস্থাতেই শুরু হয়েছিল।

দু'জনার কথার ধরন দেখে আমি নারদ-নারদ বলবো নাকি লাগ ভেলকি লাগ বলবো সেটা ভাবনাতে এনেছি কি আনি নাই তার আগেই হেসে দিয়ে প্রভাতদা বললেন,
-আতিকের মনযোগী খাওয়ার স্টাইলটা আমার খুব পছন্দ। যাক, সত্যেন বসুর সাথে আইনস্টাইনের দু'তিনটি গবেষনা ধর্মী পেপার আছে এবং সত্যেন বাবু তাঁর খুবই প্রিয় মানুষের একজন ছিলেন। কিন্তু

সত্যেন বাবুর সমস্যা ছিল, তাঁর কোন পিএইচডি ডিগ্রী ছিলনা। যে কারণে পৃথিবী বিখ্যাত সাইন্স ম্যাগাজিন গুলো তাঁর লেখা প্রথমদিকে যেমন ছাপতে চাইতোনা তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানও বানাতে চায়নি। এরপর আইনস্টাইনের রিকমেন্ডশন চিঠির মাধ্যমে উনি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিঠিটির সঠিক যত্ন নিয়েছে।

এবার আতিক সামনের খাবারের প্রতি কিছুটা অনিহা দেখিয়ে ছুড়ি-চামচ গুলো প্লেটের উপর রেখে, দু'হাতের দু'টি করে আঙ্গুল দিয়ে প্লেটটিকে ইঞ্চি খানেক সামনে ঠেলে দিয়ে বললো,
-চিঠিটার কপি না রাখলেও সমস্যা খুব বেশী নেই। ফ্রয়েড তো বলেইছেন, ভুলের পর ভুল করেই সম্পুর্ণ সত্য খুঁযে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং, যদি তারা ভুল করে চিঠিটার কপি না রেখে থাকে তাহলে তারা সম্পুর্ণ সত্যের সন্ধ্যানে নিয়োজিত আছে ধরে নিতে পারেন।

প্রভাতদা বললেন,
-বাব্বাহ, কর্পোরেট বস আতিক ফ্রয়েডের কোটেশন দেয়।
আমি বললাম,
-আমাদের বাড়িতে আতিকই প্রথম এই সব অদ্ভুত বইগুলো পড়া শুরু করেছে। আমি এখনো ভেবে পাইনা, ঐ বয়সে আতিক এসব বইয়ের মাঝে কি মজা পেতো।

আতিক বেশ অকপট স্বীকারোক্তি দিয়ে বললো,
-মজা পাবার চেয়ে উপযোগীতার বিষয়টাকে প্রাধান্য দিয়েছি। আমাদের একটা সার্কেল ছিল যেখানে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কর্মের ব্যাখ্যায় এইসব অদ্ভুত উক্তি গুলো ঝেড়ে দিতাম।

আতিক ততক্ষণে আবার তার খাবারের প্লেটটায় মনযোগ দেবার কারণে ঠিক খেয়াল করেনি যে প্রভাতদা আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন,
-নিকোলো ম্যাকায়াভেলির "দা প্রিন্স" পড়া আছে কি?

আতিক খাবারের প্লেট থেকে চোখ না তুলে বললো,
-ওসব পঞ্চদশ শতকের রাজারাজরাদের রাজনীতির কোটেশনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন উপযোগীতা নেই।
প্রভাতদা বললেন,
-কেন থাকবেনা? তার লেখায় রাজা-উজির-নাজির, সেনাবাহিনী-অভিজাতবর্গ কিংবা জনগন সবই আছে, এগুলোর মাঝে কোনটা কে তুমি বর্তমানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খুঁজে পাচ্ছো না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,
-আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দেখে তো মনে হয় আপনি রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন, আপনিও কি আতিকের সাথে একমত নাকি?
আমি বললাম,
-প্রথমত, এই একজনের, অর্থাৎ, ম্যাকায়াভেলির লেখা বোধহয় আতিকের আগে আমি পড়েছি, আর দ্বিতীয়ত, আমার রাজনীতি বোধহয় অনেকটা জমিদারী প্রথা বিলোপের দুই দশক পর জমিদার নন্দনদের যে অবস্থা হয়েছিল সেরকম।

প্রভাতদা বললেন,
-কথাটা ঠিক বুঝলাম না।
আমি বললাম,
-খুব সহজ কথা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূমির কিছু অংশের মালিকানা বাবার যে ছিল না সেটা বলা যাবে না। কিন্তু বাবা মারা যাবার সাথে সাথেই সেই অংশটা বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে আমি সে জমির বর্গাচাষীও নই, বলতে পারেন একেবারেই দিনমজুর। আপনি যদি প্রশ্ন করেন সেই জমিতে এখন কি চাষ হচ্ছে, জমির একজন দিনমজুর হিসেবে সেটার উত্তর আমার জানা থাকবার কথা নয়, উত্তর জানা নাই অথবা জেনে লাভ নাই। তবে দিন মজুর হিসেবে বহু দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা হয়তো বলতে পারি।

প্রভাতদা সাথে সাথেই বললেন,
-আপনার উত্তর কিছুটা বাঁকা কিন্তু ধরেই নিচ্ছি আপনি রাজনীতিতে আছেন। যদি থেকেই থাকেন তাহলে দয়া করে "দা প্রিন্স" বইটি পারলে মুখস্ত করে ফেলবেন, এটাকে রাজনীতির বাইবেল বললে ভুল বলা হবে না। বইটির অদ্ভুত কথা গুলোর মাঝে দু'য়েকটি লাইনের উল্লেখ করি, "সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সুশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থা"। আরেকটি লাইন আমার খুব প্রিয়, "যে মানুষ শুধুই অন্যের পরামর্শের উপর নির্ভর করে সে কখনোই খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারে না; এই অর্জনের জন্য একজনের অন্তত এতোটুকু বুদ্ধিমান হওয়া উচিৎ যাতে সে বিচার করতে পারে কোন পরামর্শটি তার জন্য ভাল আর কোনটি খারাপ"। আমার সবচেয়ে প্রিয় কোটেশন, "শুধু মানুষের আবেগের ওপর নির্ভর করা মানেই হল ক্ষরস্রোতা বহমান নদীর তীরের বালির বাধের ওপর ইমারত নির্মান করা, কারণ, মানুষ অতীতকে সহজেই ভুলে যায় এবং বর্তমানকে নিয়ে থাকতেই বেশী পছন্দ করে।"

আমি বললাম,
-"দা প্রিন্স" সহ যে কোন থিওলজিকাল ধরনের বই পড়তে আমার প্রচুর সময় কেন লাগে সেটার কারণ খুঁজতে যেয়ে বুঝেছি, এধরনের বই পড়ার সময় আমি বইটির কথা গুলোর সাথে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মিলিয়ে দেখা শুরু করি, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যাচাই করি এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে এর প্রায়োগিক সম্ভবনা খুঁজি। মানুষ অতীতের কতটুকু মনে রাখে এবং কেন মনে রাখে এই প্রশ্ন দু'টির উত্তর খুঁজতে "মানুষের শোকের আয়ু বড়জোড় এক বছর" কবির এই পঙ্কতিমালার মাঝে যে শ্লেষ লুকিয়ে আছে, সেটা আমাদের উপলব্ধিতে আনবার জন্য "বড়জোড়" কথাটির মাঝে যে অনিশ্চয়তা আছে সেখানে কিছুটা নাড়া দিলেই একটি তত্ত্বকথা বেড়িয়ে আসবে। সুদূর অতীতের কথা ছেড়ে দিন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শেষ একঘন্টায় কি করেছি সেটুকু খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে, আমাদের স্মৃতি খুব বেশী হলে এক মিনিটের মত সময়কে মনে রাখতে পেরেছে। বাকিটুকু হারিয়ে যায় আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের কাছে, নয়তো আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে সহযোগীতা করতে পারে এমন একটি নির্দেশনা তৈরীতে একটি ক্রমানুসারের মাঝে ধারনকৃত অবস্থার মাঝে।

ফিলসফি বিষয়ক আলোচনায় আমার আগ্রহ আছে, আমি বলে চলেছি,
-বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য ঘুমের কাছে যাওয়া যাক। ঘুমের বেশ কিছু সময়ের সাথে মানুষের জাগ্রত অবস্থার সময়ের ব্রেইনের কার্যক্রমের সাথে তুলনীয়। সারাদিনে ব্রেইন যে কাজগুলো সম্পাদিত করেছে, মানুষের ঘুমের সময় সেটার বিশেষ অংশগুলো বারেবারে পুনরাবৃত্তি করে ব্রেইন নিশ্চিত করে নেয় যে, একই পরিস্থিতিতে ব্রেইনের করণীয় কি, এবং যেহেতু আগামীদিন গুলোতে নতুন কোন পরিস্থিতি তৈরী

হতে পারে, সুতরাং, আজকের কর্মের আলোকে যাতে সে আগামীর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সাথে সাথেই একটি নির্দেশনা দিতে পারে সেটার জন্যও এই প্রক্রিয়াটা প্রয়োজনীয়। দিনের বাকি স্মৃতিটুকু ব্রেইন ফেলে দেয়। শোক-দুঃখ, রাগ-ক্ষোভ, ঘৃণা-ভালবাসা সহ সকল আবেগ গুলোর মাঝে সাধারণত মানুষের ব্রেইন ভবিষ্যতের জন্য প্রায়োগীক কোন উপযোগীতা খুঁজে পায়না, এক সময় এগুলো হারিয়ে যায়।

আমার কথা গুলোর পর প্রভাতদা কথা বলায় যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। সবাই চুপচাপ। আতিকই নিরবতা ভেঙ্গে বললো,
-দাদা কি আগামীকাল "সার্ন" দেখাতে নিচ্ছেন?
প্রভাতদা বললেন,
-আতিক এটা ভাল বলেছে, "সার্ন" মহাযজ্ঞ দেখারই বিষয়, পদার্থবিদ ছাড়া আর কারো বোঝার কিছু নেই। তবে তোমার ভাইয়ের লেখাগুলো পড়ার পর মনে হয়েছে, তার ভাবনা জগত সম্পর্কে আমার কোন কিছু বলবার না থাকলেও তার অসম্পুর্ন সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা গুলো সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে।

আমি বললাম,
-দাদা, সাইন্স আমি বুঝি শুধুমাত্র গুগুল আর ইয়াহু নিউজের পাতায় লেখা কিছু আর্টিকেল পড়ে। তাছাড়া ফিলসফির হাত ধরেই সাইন্স এগিয়ে চলেছে অসীমের পানে। গুগুল আর ইয়াহু প্রায় প্রতিদিনই আপনাদের সার্ন নিয়ে অদ্ভুত কিছু আর্টিকেল দেয়, যেগুলোকে ষড়যন্ত্র তত্বের সাথে তুলনা করা সম্ভব।
প্রভাতদা বললেন,
-আমি আপনাকে সাইন্সের জ্ঞান দেবোনা। আপনার লেখাতে সাইন্সের ব্যাখ্যায় আপনার অপরিপক্কতা স্পষ্ট। তবে আমি আপনার ফিলসফিটাও ঠিক বুঝতে পারিনা। ওখানেও আপনার পদচারনা কি সাইন্সের মতই বায়বীয়।

এবার আমার পালা খাবারের প্লেটের দিকে মনযোগ দেবার। বেশ চাঁছাছোলা মানুষের পাল্লায় পরেছি। এমন সরাসরি প্রশ্নের উত্তর কি দেয়া যায় সেটা নিয়ে ভাবার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। প্রায় মিনিট খানেক পর খাবারের প্লেট থেকে মুখ তুলে বললাম,
-আমি আমার লেখায় কখনো নিজের জ্ঞান জাহির করার চেষ্টা করেছি কিনা আমার মনে পরছেনা। আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য, সময় কাটানোর ক্রিয়েটিভ মাধ্যম হিসেবে। তারপরও, আমার কোন ভাবনার সাথে আপনার দ্বিমত থাকলে আলোচনা হ'তেই পারে। তবে সেটা আমার ভাবনা সম্পর্কিত আপনার মতামত।

-আপনার ইগোতে লাগলো বোধহয়।
বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আমার সামনে রাখলেন প্রভাতদা। ওরে বাবা রীতিমতো একটা ফর্দ,
১) গিলগামেশ, ঘুম ও মৃত্যু।
২) জীবন, জন্ম ও মৃত্য।
৩) কন্সাসনেস বা বোধ।
৪) ভাল, মন্দ এবং ইগো।
৫) গন্তব্য, শেষগন্তব্য ও ভবিতব্য।
৬) টাইম ট্রাভেল।

৭) একাত্ববাদ ও সৃষ্টি রহস্য।
৮) ফোর ডাইমেশনাল এবং কোয়ান্টাম পৃথিবী।
৯) বস্তু, বাস্তবতা।
১০) ফ্রি উইল।
১১) যুক্তি, যৌক্তিকতা ও পারিপার্শ্বিকতা
ইত্যাদি আরও অনেক কথা লেখা দেখে আমি কিছুটা অবাক। সবই আমার লেখার সারকথা। আমার লেখার এতো ভাল একজন পাঠক আছে সেটা ভেবে একটা ভাল লাগার বোধ যে নিজের ভেতরে কাজ করেনি সেটা বলা যাবে না। বললাম,
-গিলগামেশ তো আমার কোন লেখা নয়, আমি রেফারেন্স হিসেবে আমার একটা লেখায় ব্যবহার করেছি মাত্র। এটাকে বলা হয়ে থাকে মানব সাহিত্য ইতিহাসের প্রথম লিখিত উপন্যাস।

প্রভাতদা বললেন,
-না, ঠিক আছে, আমার আলাপের বিষয়বস্তু ছিল গিলগামেশে উল্লেখ করা ঘুম এবং মৃত্যু নিয়ে যে কথা গুলো বলা হয়েছে সে বিষয়ে আপনার মতামত। আজকে আপনার ঘুম সম্পর্কিত কথায় বুঝে নিয়েছি আপনার মতামত। সত্যি কথা বলতে কি আজকাল আল্টিমেট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই তৈরী করার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভাবনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

আতিককে এতোক্ষণে মনে হয় কথা বলতে পারার সুযোগ হাতছানি দিল, সে বললো,
-দাদা, আপনি ফর্দ করেছেন ঠিক আছে কিন্তু সাইন্টিস্ট হয়ে আমার মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নাক গলাচ্ছেন এবং বিষয়টি কখনোই ফিলসোফির না, একেবারেই সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের বিষয়। এআই কে তার ভুল থেকে শিখাতে হলে অবশ্যই তাকে বিশ্রাম দেয়া প্রয়োজন, ঐ বিশ্রামের সময়টিতে সে তার সারাদিনের কাজ গুলোর পুনরাবৃত্তি করে ভুল থেকে শিখতে পারবে। তাছাড়া প্রানী যেমন বহু কোষের সমষ্টি, ঠিক একই ভাবে এআই কে তৈরী করার সময় তার মূল প্রসেসর থেকে শুরু করে পুরো শরীরকে ছোট ছোট ইউনিট "বোট" বা রোবটের মতই প্রায় একক ক্ষমতা সম্পন্ন ইউনিট হিসেবে তৈরী করার চিন্তা চলছে, যে ইউনিট গুলোর আলাদাভাবে একক কর্মক্ষম অবস্থানের চাইতে সম্মিলিত একটি একক তৈরী করবে।

প্রভাতদা বললেন,
-হ্যা, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সেজন্যই বললাম, প্রথমটা বাদ। আসুন এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে।

আমি আকাশ থেকে পরলাম। বললাম,
-সেকি, আপনি আলাদা আলাদা করে আপনার সবগুলো পয়েন্ট আলাপ করবেন নাকি, তাহলে তো সারারাতই চলে যাবে। তাছাড়া ভুল হোক আর শুদ্ধই হোক আমার ফিলসফিকাল ভাবনা একান্তই আমার নিজস্ব ভাবনা, আমার ভাবনায় আপনি নাক গলাতে পারেন না।

প্রভাতদা বললেন,
-আপনার লেখা গুলো আমার ভাল লেগেছে তাই আমি আপনার ফিলসফি বোঝার চেষ্টা করছি, ভাবনায় নাক গলানোর প্রসঙ্গ তো এখনো আসেয়নি, এই মুহূর্তে অন্তত আমি আপনার ভাবনায় নাক গলাচ্ছি না। তবে আগামীতে নাক গলাবোনা সেই নিশ্চয়তা এখনই দিতে পারছিনা বলে দুঃখিত। তাছাড়া আপনি তো ফ্যামিলি নিয়ে আসেননি, আমার তো ফ্যামিলিই নেই, আতিকের প্রয়োজন হলে আতিক চলে যাবে ক্ষণ।

সারারাত লাগলে সমস্যা নেই। আগামীকাল রবিবার, ভোর রাতে ফেরীতে করে চলে যাবো ফ্রান্সের একটা দ্বীপের মত যায়গা আছে জেনেভার পেটের মাঝে, সেখানে যেয়ে ব্রেকফাস্ট করে "সার্ন" দেখে একবারে ঘুমাতে গেলে সমস্যা কোথায়।

আতিক দেখলাম প্রভাতদার সাথে একমত, বললো,
-আমার সমস্যা নেই। আমার ফুল ফ্যামিলি মাদ্রিদ।
আমি বললাম,
-আমি বেড়াতে এলে ঘুম নিয়ে টেনশন করিনা কিন্তু আপনার ফ্যামিলিই নেই মানে কি বুঝলাম না।
প্রভাতদা বললেন,
-ধরে নিন সন্ন্যাস জীবন।
আতিক বললো,
-এ প্রসঙ্গটা থাক।
প্রভাতদা বললেন,
-থাকা থাকির কিছু নেই, আমার মেয়ে, মেয়ে জামাই, নাতি, ছেলে, স্ত্রী সবাই বছর সাতেক আগে রোড এক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে।

কিছুটা হতচকিত আমি শব্দহীন চুড়ান্ত সত্যের সামনে নিঃশব্দতায় নিস্তব্ধ। আসলে এধরনের তথ্য জানার পর কি বলা উচিত সেটা নিয়ে আমি আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারিনি। তাই ছোট্ট করে দুঃখিত বলে খাওয়ার দিকে মনযোগ দিলাম। নিরবতা ভাঙ্গার উদ্দেশ্য নিয়েই বোধহয় আতিক আমার সামনে রাখা প্রভাতদার লিস্ট টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললো,
-আপনার লিস্টের পরবর্তি আইটেম দুটো, জীবন, জন্ম ও মৃত্যু এবং কন্সাসনেস বা বোধ। “সাত্রে”র একটা উক্তির বাংলা অনেকটা এরকম দাঁড়াবে, জীবনের বিশুদ্ধতা মানুষের চলমান অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল, জ্ঞানের ওপর নয় “In this way death emphasizes the burden of our free, individual existence” এবং আরেক যায়গায় বলেছেন, সময় একটি সরল রেখায় শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে যায়, সুতরাং, “human are condemned to be free and can act without being determined by our past which is always separated from us."

প্রভাতদা হেসে দিয়ে বললেন,
-এবার বুঝলাম আতিক কেন ছোটবেলা থেকেই ফ্রয়েড, সাত্রে ইত্যাদি পড়তো। আমরা এখানে একাত্ববাদকে মেনে নিয়ে আলোচনা করছি। সাত্রে কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকেই স্বীকার করতো না, একাত্ববাদ তো বহু দূরে। “সাত্রে”র জীবন লব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা একান্তই তার নিজস্ব এবং জীবন-জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত তার ভাবনাকে শেষ সিদ্ধান্ত ধরে নেবারও কোন যুক্তি নেই।

আতিক এবার একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললো,
-উপস, ধরা খেয়ে গেলাম। তবে যেটাই বলেন, সাত্রের জীবন-জন্ম-মৃত্যু এবং কন্সাসনেসের ধারনাকে বাতিল করার মত তত্ব আর কেউ দিতে পারেনি।

প্রভাতদা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন,
-ফিলসফাররা মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যা ইচ্ছে বলে ফেলেন, সেটাকে বাতিল করার মত তথ্য বা জ্ঞান মানুষের কাছে না থাকার সুযোগটি তারা নেন। কিন্তু কোয়ান্টাম লেভেলে যদি ভাবা যায় তবে

দেখা যাবে শক্তি, পদার্থ, জীবন এবং কন্সাসনেস সব একসূত্রে গাঁথা। এখান থেকেই সাইন্সের একাত্ববাদী ভাবনার সূচনা।

আতিক এবার একটু অধৈর্য হয়েই বললো,
-"সাত্রে" একাত্ববাদী নয় বলে আপনি এই আলোচনা থেকে তাকে বাদ দিতে চাইছেন কিন্তু সময়ের একমূখী সরলরেখায় চলার যে বাণী তিনি দিয়েছেন সেই বিষয়ের বিরুদ্ধে যাবার মত কোন তত্ব তো আপনারা এখনো হাজির করতে পারননি। সাত্রের কথার উপর ভর করে আমি যদি ঘোষনা দেই, আমাদের মহাবিশ্বের সময় কখনো অতীতে ফিরতে পারবে না, আমদের মহাবিশ্বের যাপিত জীবন ইতিহাস মুক্ত, তাহলে আপনি কি বলবেন।

প্রভাতদা বললেন,
-ওয়াও, সাত্রের ওপর এতো ভরসা!! নাহ, সাত্রের ঐ কোটেশনকে স্বীকার বা অস্বীকার না করেই আমি দু'টি কথা ছাড়া কিছুই প্রায় বলবোনা। প্রথমত, তোমার দাবীকৃত কথাটি আংশিক সত্য। দাবীটি হবে, সাইন্স সাত্রের বাণীকে ফেলে দেবার মত কোন তথ্য এখনো হাজির করতে পারেনি এবং দ্বিতীয়ত, অতীতে ফেরা যাবে কিনা সেটা নিয়ে যদি সার্নের কোন সাইন্টিস্ট বেশী আগ্রহী হয় তবে সেটা আমারই হবার কথা বেশী। যেদিন এক্সিডেন্টে আমার পুরো ফ্যামিলি মারা যায় সেদিন আমার গাড়ি চালাবার কথা ছিল, আমি জরুরী কাজে আটকে যাওয়াতে যেতে পারিনি। যদি আমি গাড়িটি চালাতাম তবে হয়তো এক্সিডেন্ট হ'তো না অথবা আমারও আজ তাদের সাথেই অন্য যায়গায় থাকতে হ'তো। আগামীকাল "সার্ন" দেখার সময় এই বিষয়ে বর্তমানে সাইন্সের অবস্থান ব্যাখ্যা করবো, আজ শুধুই ফিলসফি, নো ফিজিক্স।

দাদার ব্যক্তিগত দুঃখের ওজনের গভীরতা উপলব্ধি করার পর স্বাভাবিক ভাবেই কথা আর আগাবেনা। আতিক সবসময়ই এধরনের সিচুয়েশনে খুব বাস্তববাদী উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এখানেও সেটার ব্যতিক্রম হ'ল না। আতিক ওয়েটারকে ঈশারায় আমাদের সান্ধ্য ভোজের পরিসমাপ্তির কথা জানিয়ে দিয়ে বললো,
-দাদা, আজ আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করি। আগামীকাল সকাল দশটার কিছু আগেই আমরা সার্নে পৌঁছে যাবো। ফর্মালিটিজ আমার জানাই আছে, আমি সব শেষ করে আপনার হাতে ভাইকে সমঝিয়ে দিয়ে চলে আসবো। "সার্ন" আমি বহুবার দেখেছি, আমার কাল একটা জরুরী মিটিং আছে, কিছুতেই এড়াতে পারিনি। দুপুর একটার আগেই মিটিং শেষ করে চলে আসবো, তারপর একসাথে লাঞ্চ।

প্রভাতদা কোন কথা না বলে মিনিটখানেক সময় নিয়ে গ্লাসের পানিটুকু খেয়ে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন,
-অনেক কথা বলার ছিল আপনাকে। আতিক তো আমাকে বাসায় নামিয়ে দিচ্ছো, যেতে যেতে আরও কিছু কথা আলাপ করা যাবে কিন্তু তুমি যেহেতু আগামীকাল সার্ন পরিদর্শনে আমাদের সাথে থাকছো না, সুতরাং, একটি কথা তোমার সামনেই আলাপ করে রাখি। আগামীকাল সার্নে তোমার ভাইকে সাথে নিয়ে আমার প্রজেক্টের একটি যন্ত্রের প্র্যাকটিক্যাল ডেমোন্সট্রেশন করবো। রিস্ক ফ্যাক্টর অনেক। তবে এপর্যন্ত আমি যতবার মেশিনটিতে চড়েছি কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই ফিরে এসেছি।

আমি বললাম,
-ফিরে এসেছি মানে, টাইম মেশিন নাকি? আপনাদের সার্ন সম্পর্কে যেসব গুজব আছে তার মাঝে ডাইমেনশন পরিবর্তন থেকে শুরু করে টাইম মেশিন পর্যন্ত আছে।

প্রভাতদা খুব ঠান্ডা গলায় বললেন,
-গুজবে কান দেবেন না। তবে হ্যা, সার্নের কর্মের পরিধির প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে অনেক কিছুই হয়তো আমরা জানতে পারবো কিন্তু আমার মূল কাজ ব্ল্যাকহোল এবং ওয়ার্মহোল সম্পর্কিত। আপনার প্রতি আমার আগ্রহের কারণ আপনার একটি কথাতেই, সেটা হল, আপনি আপনার একটি লেখায় বলেছেন, আমরা ফোর ডাইমেশনাল এবং কোয়ান্টাম পৃথিবীতে বসবাস করছি বলে আপনি বিশ্বাস করেন। আমিও প্রায় একই বিশ্বাস নিয়ে সার্নে কাজ করছি।

আতিক খুব ছোটবেলা থেকেই আমাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাইরে বাইরে পড়ালেখা করেছে, যে কারণে তার পারিবারিক আবেগ সংক্রান্ত বিষয় গুলোতে তাকে আমার কিছুটা নিস্পৃহ মনে হয়েছে সব সময়ই। কিন্তু আজ সেই ধারনায় কিছুটা চিড় ধরলো। সে বললো,
-দাদা, এমন কোন কাজ করবেন না যেটাতে আমার বড় ভাই আপনাদের সাইন্টিফিক গিনিপিগ হিসেবে স্যাক্রিফাইসড হয়।

এর মাঝেই ওয়েটার বিল নিয়ে আসলো। আমাদের দেশে এই খাবারের বিল দেয়া নিয়ে বহু নাটক তৈরী হয়। কিন্তু বিদেশে এলে দেখি সকলেরই জানা থাকে কে কখন বিল দেবে। প্রভাতদাকে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বিলটা টেনে নিতে দেখে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করলাম। আতিকের দিকে তাকিয়ে বললাম,
-আমি আজকের ডিনারের বিলটা পরিশোধ করতে চাই।
প্রভাতদা বললেন,
-কেন, আপনি দেবেন কেন? আপনার এবারের জেনেভা সফর আমার জন্য, সব ট্রীট আমার।
আতিক বললো,
-ঠিক আছে। তবে আমার বড় ভাইয়ের অনারে কালকের লাঞ্চ আমার ট্রীট।

**<u>গাড়িতে গপ্পো</u>**

আমার এই একটা অভিজ্ঞতা খুব ভাল। সিলেট, সুনামগঞ্জ, বৃটেন, ইউরোপে কোন মতে শরীরটাকে হাজির করতে পারলেই হল, এরপর আমার পকেট থেকে আর কোন টাকা খরচ করতে হয় না। এখনতো এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, কোথায়ও আমার আর কোন টাকা খরচের কথা মনেই থাকে না। আমার স্ত্রীর খোঁচাখুঁচিতে অনেক সময় সম্বতি ফিরে আসে। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গাড়ি পর্যন্ত যাবার সময়টুকু প্রভাতদা দিলেন না, বললেন,
-আসুন, আপনার ফিলসফি নিয়ে আলোচনা পর্বটা আজকেই শেষ করে ফেলি।

আমার কেন যেন মনে হল, প্রভাতদা আমার ফিলসফি ভাবনার দূর্বল যায়গা গুলো নিয়ে আলাপ করতে চাইছেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম,
-আবারও বলছি, আমার কিছু ভাবনা আছে, নিতান্তই আমার নিজস্ব ভাবনা, ফিলসফি নয়। ওটা নিয়ে কোন আলাপ নয়। আপনার নিজের কোন ফিলসফি থাকলে বলুন, সেটা আমার সাথে না মিললেও লিখে ফেলবো।

প্রভাতদা কিছুক্ষণ চুপ, তারপর বললেন,
-একটা কোটেশন মনে এলো, কে বলেছেন মনে নেই, “সমষ্টিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে গোষ্ঠী স্বার্থ অথবা ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় যারা ব্যস্ত হয়, সে বা তারা জনতার শত্রু”। এই সমষ্টিগত ভাবনায় মানুষের

প্রথম শত্রু মানুষের ইগো। স্বার্থপরতার ডেফিনেশন খুব সহজ। মানুষ যখনই অন্যের দোষ খোঁজার চেষ্টায় নিজের দোষ গুলো হারিয়ে ফেলে এবং সেই সূত্রে নিজের দোষ ঠিক করার সমস্ত পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে অন্যের দোষ গুলো পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয়, সেই মুহূর্তে সে ইগো কেন্দ্রীক স্বার্থপর মানুষ হিসেবে তার প্রথম সোপাণে আরোহণ করে। এর বিপরীত অবস্থানটি হল, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা। নিজের দোষ গুলো যারা খুঁজে বের ক'রে সেগুলো সংশোধন করে নিতে পারে, তারাই ইগো বিসর্জন দিয়ে সব দোষ-ত্রুটি-মতামত সহ আরেকজনকে ভালবাসতে পারে এবং তখনই সে ইগো কেন্দ্রিক স্বার্থপরতার উর্ধ্বে চলে যায়। যেমন ধরুন, আপনি রবীন্দ্র সঙ্গীত খুব ভাল গাইতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি আপনার অনুরাগ নিয়ে সঙ্গীত চর্চা চালিয়ে যাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ভালবাসাকে আকড়ে ধরে এগিয়ে যাবেন, যেই মুহূর্তে আপনি মনে করলেন "আমি" রবীন্দ্র সঙ্গীত "শিল্পী", সেই মুহূর্তে আপনার ইগো আপনাকে গ্রাস করে ফেললো, আপনাকে আমিত্বে পেয়ে বসলো।

আমার নিজস্ব ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে না চাওয়ার রক্ষণশীল মানসিকতাকে প্রভাতদা খোঁচা দিলেন কিনা সেটা নিয়ে ভাববার সময় নেই আমার। দাদার বিশাল বক্তৃতার মাঝেই একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ হ'ল মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, প্রভাতদা একটু থামতেই বললাম,
-এখানে আমার একটা কথা আছে। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষত, একজন মা যখন তার সন্তানকে পড়ালেখায় অমনযোগীতার জন্য বকাঝকা করে, তখনও তো সেই মা তার সন্তানের কিছু একটা পরিবর্তনের জন্যই সেটা করছে। এটাকেও আপনি কি আপনার এই "ইগো"র ডেফিনেশনের সাথে মেলাবেন?

প্রশ্নটা করেই মনে পরলো প্রভাতদার এক্সিডেন্টের কথা, মনে হ'ল ভুল যায়গায় ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছি, প্রভাতদা দুই তিন সেকেন্ড নিশ্চুপ, তারপর বললেন,
-পিতা-মাতা-সন্তানের সম্পর্কের ব্যাখ্যা এভাবে কেন করবেন? ওটা বাৎসল্য। তার সন্তান পরীক্ষায় প্রথমই হোক আর খুব খারাপই করুক, সন্তানের প্রতি ভালবাসার কোন ঘাটতি হবে না। বকাঝকা করছে, কারণ, সন্তানকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করতে চাইছে। এটা আরেক সাবজেক্ট, এই আলোচনা আজ না করাই ভাল।

পরিবেশ হালকা করার জন্য অকপট স্বীকারোক্তি দিয়ে বললাম,
-তাহলে আমার জ্ঞ্যান-অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আমি বলতে পারি, আমি অবশেষে একজন শুধুই মানুষ।

প্রভাতদা বললেন,
-আপনার সাথে আমার বিশাল আলাপ, মাঝখানে মাঝখানে যদি আপনি কথা ঘুড়িয়ে দিতে থাকেন তবে কথা কখনই শেষ হবে না এবং আপনার সার্নে আসবার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আপনি তো আপনার লেখার এক যায়গায় বলেছেন, আপনি আপনার চিন্তা কে অনুস্মরণ করতে পারেন। এমনও কি কখনো হয়েছে, আমি এখন দু:শ্চিন্তা করব, দু:শ্চিন্তা-দু:শ্চিন্তা ক'রে জপে জপে কখনো কি নিজের ইচ্ছায় দু:শ্চিন্তা করতে পেরেছেন।

আমি “না” বলার সাথে সাথেই বললেন,
-পারবেন না, কারণ আপনার ভেতরের “আমি” আপনাকে সবসময় ভাল রাখতে চাইছে। এটাই নিজের প্রতি নিজের ভালবাসা এবং এটাই ইগো। এবার বলুন, আপনার কি কখনো কোন একটা ভাবনাকে নিজের ভাবনা মনে না হবার কারণে প্রশ্ন জাগেনি মনে যে, এই ভাবনা আপনার মাথায় কিভাবে এলো।

আমি বললাম,
-হ্যা, এসেছে।
প্রভাতদা বললেন,
-এটাই সমষ্টিগত যে ভাবনা বলয় আপনার চারপাশে রয়েছে তার প্রভাবশালী অংশ। এটাই সেই ইগো কেন্দ্রীক "আমি" কে ভাল রাখতে চাইবার আপ্রান প্রচেষ্টা, যেটা বুঝতে না পারলে একটা মানুষ একসময় না একসময় স্বার্থপর হ'য়ে উঠবে।
আমি বললাম,
-আমার ইগো যদি আমাকে ভালই রাখতে চায় তাহলে স্বার্থপর হতে আপত্তি কোথায়।

প্রভাতদা আমার স্বার্থপরতাটুকু এড়িয়ে গিয়ে পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্যই বোধহয় খুব জোড় গলায় বললেন,
-আপনাদের স্যাটারডে ক্লাবের একটা শাখা জেনেভাতে খুলতে চাইছি। আমিই কনভেনর।

আতিক হেসে দিয়ে বললো,
-দাদা আবার পদ পদবী নিয়ে এতো চিন্তিত হলেন কবে থেকে।
প্রভাতদা বললেন,
-পৃথিবীর কিছুই এখনো দেখোনি আতিক। সব কিছুই আপেক্ষিক। এই বিশ্বে অনেক কিছুর জন্যই পদ-পদবী এবং সাথে আবার সঠিক সময়েরও অপেক্ষায় থাকতে হয়। প্রমাণ সহ তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি।

অতিকের এইসব সংজ্ঞাহীন অপ্রাসঙ্গিক আলাপচারীতার চেয়ে আমি প্রভাতদার কথা শুনতে বেশী আগ্রহী। আলোচনার মোড় ঘোরাবার চেষ্টায় বললাম,
-দাদা, আপনি যদি আপনার ক্লাবের নাম স্যাটারডে ক্লাব, জেনেভা বা ইউরোপ করেন তবে আমাদের ক্লাবের মৌলিক চার সদস্যের অনুমোদন লাগবে এবং আপনি হবেন আমাদের ক্লাবের একটি শাখা। তারচেয়ে বরং, ইউরোপীয়ান স্যাটারডে ক্লাব খুলে বসেন।

আতিক গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বললো,
-দারুন, নামটা খুব ভাল লাগলো। আমারও একটা পদবী লাগবে। দাদা প্রেসিডেন্ট আর আমি সিইও।
প্রভাতদা শিশুসুলভ চপলতায় হাত তালি দিয়ে বললেন,
-সিইও, কর্পোরেট গন্ধও রইলো, এটাই ফাইনাল, ইউরোপীয়ান স্যাটারডে ক্লাব।

নাহ, কিছুতেই এদের লাইনে ফেলতে পারছিনা দেখে ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু আমি সরাসরিই বললাম,
-দাদা, আপনার আলাপটা শেষ করুন। আগামীকাল তো শুধুই সাইন্স।

এবার মনে হল প্রভাতদা বেশ মজা পেলেন, বললেন,
-আমি তো ভাবলাম আপনার ফিলসফিকে আপনি একান্ত আপনার নিজস্ব সম্পত্তি মনে করছেন, যাক, আমি আমার কথাই বলি। আপনার যেহেতু নিজস্ব একটা বিশ্বাস আছে, সুতরাং, প্রতিটা পয়েন্ট আলাপ করতে হলে যুক্তি-তর্কে প্রচুর সময় লাগবে। কিছু আলাপ কাল করা যাবে। আজ শুধু মৃত্যু নিয়েই আলাপ করি। মানুষের পক্ষে মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব মৃত্যুর পরেই, আগে নয়। কারণ,

১) মানুষ বাঁচার তাগিদের কারণে এতো ব্যস্ত থাকে যে, মৃত্যু নিয়ে ভাববার সময় পায় না।
২) জন্মাবার কিছুদিন পরই মানুষের ব্রেইন সকল কিছুর গাইড লাইন তৈরী করে দেয়। যেমন, আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারনা তৈরী করতে সে ডিক্টেট করে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থানগত দিক গুলো। ঠিক একই ভাবে মানুষের ব্রেইন মানুষের মাঝে মৃত্যু সম্পর্কিত একটা ধারনা তৈরী করে দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, মৃত্যু একটা এক্সিডেন্ট মাত্র, ওটা তোমার জন্য নয়, তুমি তোমার যাপিত জীবনের পেছনে ছুটতে থাকো, মৃত্যু তোমাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারবেনা। ব্যাস, শুরু হয় মানুষের জীবনের পেছনে ছোটা। ব্রেইনের এই অবস্থানকে এড়িয়ে যেয়ে মানুষের পক্ষে মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করবার সম্ভবনা প্রায় শুন্য। তারচেয়ে বরং মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের জিজ্ঞাসার কারণে সৃষ্টিতত্ব বা জন্মতত্ব নিয়ে ভাববার সম্ভবনা বেশী।

আমি বললাম,
-বুঝলাম, আপনি মৃত্যু নিয়ে না ভেবে জন্মতত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে বেশী আগ্রহী।

গাড়ি চালাচ্ছে আতিক, আতিকের পাশে বসেছেন প্রভাতদা আর আমি দাদার পেছনের সিটে বসে শরীর এলিয়ে আধা শোয়া আয়েশী ভঙ্গিতে কথা বলছিলাম। আমার কথা শোনার পর দাদা এক ঝটকায় ঘাড় ঘুড়িয়ে আমাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর স্বরে ধীরে সুস্থে বলা শুরু করলেন,
-আমার চেয়ে বেশী মৃত্যু নিয়ে খুব কম মানুষই ভাবে। বরং আপনার লেখায় আপনি ঘুম এবং মৃত্যুকে একসাথে ঘুলিয়ে ফেলেছেন কেন সেটার ব্যাখ্যা আমি দিলাম, মৃত্যু এবং ঘুম দুটো আলাদা বিষয়।

আমি বললাম,
-ঠিক আছে, আমার ভাবনায় মৃত্যুর স্থান খুব কম কিন্তু আপনি মৃত্যু এবং ঘুমকে ঘুলিয়ে ফেলা নিয়ে যে প্রসঙ্গে আলাপ করছেন সেটা বোধহয় আমার বক্তব্য না। ওটা "গিলগামেশ" উপন্যাসটির একটি উক্তি।

আতিক বোধহয় সদ্য প্রস্তাবিত ইউরোপীয়ান স্যাটারডে ক্লাবের সিইও হিসেবে নিজের উপযোগীতা বোঝাবার জন্যই বললো,
-এই এক যায়গায় আমার আপত্তি আছে। আমি প্রচুর বই পড়েছি এবং বহু কোটেশন আমার মুখস্ত। কোটেশন হিসেবে তো আমার মতের সাথে মিল আছে বা আমার ভাল লাগে এই ধরনের যায়গা গুলোই আমি আমার মনে গেঁথে নেই। তোমার এই লেখাটা আমি পড়েছি এবং "গিলগামেশ"ও পড়েছি। কই গিলগামেশ পড়বার পর আমার তো "মানুষ যেখানে ঘুমকেই জয় করতে পারে না সেখানে মৃত্যঞ্জয়ী হবার দূরাশা করে কিভাবে" ধরনের কোটেশন আমার মনে দাগ কাটেনি। তোমার মনে দাগ কাটা মানেই হল তুমি ওটা বিশ্বাস কর।

আমি বললাম,
-যুক্তি তর্কের জন্য অনেক সময়ই নিজের বিশ্বাসের বাইরে যেয়ে প্রতিপক্ষের কথা গুলোকে প্রাধান্য দিতে হয়। তাছাড়া এখানে আমি যদি ঘুম এবং মৃত্যুকে ঘুলিয়েও ফেলে থাকি তারপরও ঘুম এবং মৃত্যুর পার্থক্য যোজন যোজন দূরে রেখেই করেছি। এই মুহূর্তে এসব আলাপের চেয়ে আমি বরং দাদার বলা "জন্মের পর থেকেই ব্রেইন আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারনা তৈরী করতে সে ডিক্টেট করে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থানগত দিক গুলো", এটার ব্যাখ্যা জানাটা বেশী প্রয়োজনীয় মনে করি।

প্রভাতদা আমার বক্তব্যে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন বোধহয়, বললেন,
-ছোট ছোট দ্বন্দ্ব গুলো আমরা এড়িয়ে যাই বড় দ্বন্দ্ব তৈরী করার খোঁজে। আমি চাইছি ফিলসফি নিয়ে আলাপ করতে আর আপনি বারে বারে সাইন্সে ফিরে যেতে চাইছেন।

আমি বললাম,
-আমার মত ফিলসফার রাস্তা ঘাটে পাওয়া যায় কিন্তু আপনার মত জ্ঞ্যানী এবং স্বনামধন্য সাইন্টিস্টের সাথে এরকম নিবিড় আলাপন ক'জন মানুষের কপালে জুটবে বলুন।

প্রভাতদা হেসে বললেন,
-আপনি যে বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাইছেন সেটা বিশাল সাবজেক্ট। আমরা আমার বাসার কাছে চলে এসেছি, আজ এই প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করলে খেই হারিয়ে ফেলবো। কালকের জন্য না হয় তুলে রাখি।

আতিক বললো,
-আমাদের সময়ের তো কোন অভাব নেই। আপনার বাড়িতে আমাদের বসার ব্যবস্থা করতে পারবেন না, দু'এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবেন না সেটাও বিশ্বাস করতে বলেন নাকি।
প্রভাতদা বললেন,
-একা থাকি, কফি মেশিন, ডিশ ওয়াশার সবই আছে, যার যত ইচ্ছে খেতে অসুবিধা নেই। আজ তোমার বড় ভাইয়ের সুবাদে বাইরে বাইরেই সময় কাটাতে চেয়েছিলাম। ঠিক আছে চলো, আমার বাসাটাও তোমার ভাইকে চিনিয়ে রাখি।

**<u>সাইন্টিস্টের বাড়ির গপ্পো</u>**

বিশ্বখ্যাত একজন সাইন্টিস্টের বাড়ি দেখার সৌভাগ্যও হল। আমার ছোট ভাই আতিক জেনেভায় যে বাড়িটিতে থাকে, বিগত বছর দশেক আগে তার সেই বর্তমান বাড়িটি প্রথমবারের মত আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। চারটি আলাদা পরিবারের জন্য এক বিশাল এপার্টমেন্ট কম্পলেক্স। বাস্কেটবল কোর্ট, টেনিস কোর্ট, সুইমিংপুল, সুয়ানা থেকে শুরু করে কি নেই সেই কমপ্লেক্সে, শুধুই চারটি পরিবারের জন্য। কারা এতোসব কখন ব্যবহার করে সেটা আমার বোধগম্য না। আমি যখনই জেনেভায় এসেছি তখনই ভাতিজা, ভাতিজি কে নিয়ে তাদের কমপ্লেক্সের সব কিছুই ব্যবহার করেছি কিন্তু কখনোই অন্য কাউকে পাইনি, শুধুই আমাদের পারিবারিক তিন/চারজন।

সেই তুলনায় সাইন্টিস্টের বাড়িটি একটি দোতালা কাঠের কুড়ে ঘর বলে মনে হল। বাড়ির ভেতরে হাঁটলে পাটাতন গুলো মচমচ শব্দে জানান দেয় তার শেষ বয়সের কথা। তবে তার বাড়ির সামনের লম্বা বাগানটি খুবই চমৎকার। চারিদিকে হাল্কা গার্ডেন লাইটের আলো আধাঁরীর মাঝে এক বিশাল ছাতার নীচে গাছের গুড়ি রাখা, যেটা টেবিলের কাজ করে। টেবিলের চারপাশে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রয়েছে আরও গোটা ছয়েক ছোট ছোট গাছের গুড়ি, বসার জন্য। পরে জানলাম, বাড়িটি অভিজাত এলাকায় আভিজাত্যের প্রতীক, আসলেই প্রায় তিনশো বছরের পুরানো।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, ঠান্ডা না লাগা পর্যন্ত বাইরে বসেই কফি খাবো। প্রভাতদা জানিয়ে দিলেন, প্রথমবার শুধু তিনি কফি সার্ভ করবেন। তারপর কারও কফি প্রয়োজন হলে নিজের বানিয়ে নিতে হবে।

পরিবেশটা পছন্দ হওয়ায় বুঝে নিলাম, ম্যারাথন আড্ডার সম্মুখীন আমরা তিনজন। প্রভাতদাই প্রথম আলাপ শুরু করে বললেন,
-"সার্ন" কাজই করছে বস্তু এবং বস্তুর অবস্থাগত বিষয় নিয়ে। আগামীকাল সার্নে আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টটা আপনাকে দেখাবো সেটাও মূলত এই বিষয়ের ওপর, সুতরাং, ঐ বিষয়ে কিছু আলাপের প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটা সময় থাকলে করা যাবে নয়তো আগামীকাল আমরা প্রচুর সময় পাবো আলাপ করার।

আমি বললাম,
-এই ধরনের জটিল বিষয় আগামীকালের জন্য যদি তুলে রাখেন তবে বিশাল সার্ন দেখাবেন কখন। আগামীকাল সার্ন দেখার সময় তো মাত্র তিন ঘন্টা।

প্রভাতদা বললেন,
-সেটা কালই হাতে-কলমে বুঝে নেবেন নাহয়। এখন আমরা আপনার লেখার একটি বিষয় যদি আলাপ না করি তবে আগামীকাল আমার প্রজেক্ট আপনার কাছে আধিভৌতিক থেকে যাবে। আপনার লেখায় এক যায়গায় মাল্টিভার্স নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু শুধু ছুঁয়ে চলে গিয়েছেন। আপনার লেখা নিয়ে আমার কমপ্লেইন এখানেই। আপনি লেখার ব্যাপ্তী বেশী বাড়িয়ে ফেলেন, যে কারণে সবই ধোঁয়াশার মাঝে থেকে যায়।

আতিক আমার কথা গুলো বোধহয় গ্রহণ করতে পারেনি, বললো,
-এইসব হাইপোথিসিসের জন্ম দিয়েছে কোয়ান্টাম থিয়োরী কিন্তু সাইন্স শুধুই হাইপোথেসিস নিয়ে কবে থেকে মাথা ঘামানো শুরু করলো?

প্রভাতদা খুব গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন,
-ফিলসফি, হাইপোথিসিস, সাইন্স ইত্যাদি বিষয় গুলো সব একে অপরের পরিপূরক কিন্তু কেউ কারোর ওপর প্রভুত্ব করেনা, একসময় এসে সবই এক হয়ে যাবে আতিক। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্মের সময় সেটাকে হাইপথিসিস হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমান বিজ্ঞানে কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রমাণীত সত্য এবং এটমিক এনার্জি যেমন বিশ্বে একটি যুগান্তকারী যুগের সূচনা করেছিল তেমনি আগামী দিনের বিশ্ব নিয়ন্ত্রন করবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। মাল্টিভার্স, প্যারালাল ইউনিভার্স, ডার্ক ম্যাটার বা এধরনের আরো অনেক হাইপোথিসিস সম্পর্কে সাইন্স এখনও কোন প্রমান হাজির করতে না পারলেও আগামীর সাইন্স সেগুলোর সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারবে না বলে কোন সিদ্ধান্ত এখনই নেয়া সম্ভব নয়।

আতিকের মনে হয় আমাদের এই শান্ত পরিবেশটা পছন্দ হচ্ছে না। তাই তাতিয়ে দেবার জন্যই বোধহয় খুব খেলাচ্ছলে বললো,
-সেটা আপনার বিশ্বাস হতে পারে কিন্তু হাইপোথিসিস কখনোই বিজ্ঞান নয়। আপনি বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানের একজন মূল প্রতিধিত্বকারী হিসেবে সাধারণ মানুষের ভাবনাকে ডিরেইল্ড করার দায়ীত্ব নিতে পারেন না। আমার ভাই তার লেখায় বলেছে আমরা নাকি প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষণে "আমার" "আমি" দিয়ে আরেকটি ইউনিভার্স তৈরী করে চলেছি এবং সেই সাথে আমাদের একটি কপি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকতারও একটি কপি ঐ ইউনিভার্সে চলে যাচ্ছে। তাহলে আমার জীবনের চলার পথে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবার কারণে আমি যত গুলো ইউনিভার্স তৈরী করেছি, তার বহু যায়গাতেই আপনার উপস্থিত থাকারই সম্ভবনা নেই, সেই ইউনিভার্স গুলোতে এই মুহূর্তে কি ঘটছে বলে আপনি মনে করেন।

আতিক যদি পরিবেশ নষ্ট করার কোন ইচ্ছে থেকে এই ধরনের বক্তব্য দিয়েও থাকে তাহলে সেটা ব্যার্থ হয়ে গেল প্রভাতদার পরবর্তি কথায়,
-প্রথম কথা, আগেই বলেছি সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তোমার ভাইয়ের ধারনা গুলো স্পষ্ট নয়, ভাসা ভাসা। প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষণে যে ইউনিভার্স তৈরী হবার কথা তুমি তোমার ভাইয়ের ভাস্যে বললে সেটার বহু দিক আছে। একটি পক্ষ বলে একটি মানুষ তার জীবনে চলার পথে লক্ষ কোটি ইউনিভার্স তৈরী করে চলেছে, আবার আরেকটি পক্ষ বলে থাকে, প্রতিটি মানুষ সারা জীবনে সর্বোচ্চ ১৮টি ইউনিভার্স তৈরী করে থাকে। তার সকল সিদ্ধান্তই ঐ সর্বোচ্চ আঠারোটি ইউনিভার্সে বন্টন করা হ'য়ে থাকে। এবার আসো তোমার মূল প্রসঙ্গে, তুমি তো আজই সন্ধ্যায় জানালে তুমি আমাদের সাথে আগামীকাল সার্নে যাচ্ছো না। ধরে নাও আগামীকাল সার্নে আমার প্রজেক্টের প্র্যাক্টিকাল ডেমনস্ট্রেশনে একটি দুর্ঘটনায় তোমার ভাই আর আমি ফিরে এলাম না। তোমার মন খারাপ হবে কি?

আতিকের সপ্রতিভ উত্তর,
-অবশ্যই হবে।
প্রভাতদা বললেন,
-মাল্টিভার্স বা প্যারালাল ইউনিভার্স হাইপোথিসিস বা থিয়োরী অনুযায়ী আমরা যদি আগামীকাল ফিরে না আসি তাহলে এই বিশ্বে আমাদের তিনজনের সাথেই পরিচয়হীন একজনের মন খারাপ হতে পারে। কেন বলতে পারো কি?

কোন রাগ-ক্ষোভ বা অন্য কোন কিছু আতিকের গলার আওয়াজে প্রকাশ পেলনা, খুব স্বাভাবিক গলায় বললো,
-একেবারেই আজগুবী কথার উত্তর আমার কাছে কখনোই নাই।
প্রভাতদা বললেন,
-আগেই আজিগুবী বলাটা ঠিক নয়। তোমার কি কোন কারণ ছাড়া কখনও মন খারাপ হয়নি?
আতিক বললো,
-হ্যা হয়েছে।

প্রভাতদা বললেন,
-কখনো খোঁজার চেষ্টাও তো করনি কেন মন খারাপ হয়েছে। মাল্টিভার্সের থিয়োরী অনুযায়ী, যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তুমি আগামীকাল আমাদের সাথে সার্নে যাচ্ছো, ঠিক তখনই আরেকটি প্যারালাল রিয়ালিটি ইউনিভার্স তৈরী হয়েছে এবং আগামীকাল আমরা যদি না ফিরি তাহলে ঐ ইউনিভার্সে তুমিও আর ফিরবেনা। কিন্ত তুমি আগামীকাল সার্নে না যাবার কারণে বর্তমান এই ইউনিভার্সে এমন মানুষও আছে যাদের সাথে অতীতে তোমার নেয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে এই ইউনিভার্সে পরিচয় না ঘটলেও ঐ না ফেরার ইউনিভার্সে পরিচিত ছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঐ মানুষটির এই ইউনিভার্সে মন খারাপ হবে।

আতিক আরও আক্রমনাত্মক হয়ে বললো,
-যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজ্যে হ্যাসিস প্রেসক্রাইবড ড্রাগস হিসেবে প্রচলিত বলে আমার জানা আছে কিন্ত সুইজারল্যান্ডেও যে প্রচলিত সেটা জানা ছিল না। আপনি এইসব গাঁজাখুরী গল্প মাথায় নিয়ে বর্তমান বিশ্বের সাইন্স ডিক্টেট করছেন কিভাবে বুঝলাম না।

এবার বুঝলাম রেগে গেলে প্রভাতদা ঠান্ডা স্বরে কথা বলেন,
-আতিক, বিশ্বাসই মানুষের পারিপার্শ্বিকতা তৈরী করে। মানুষের ব্রেইনের কাজই হল মানুষের বিশ্বাসের যায়গাটুকু তৈরী করা। যেমন ধর, তোমাকে তোমার ব্রেইন ডিক্টেট করছে তুমি এখন জেনেভাতে আমার বাসার বাগানে একটি বড় ছাতার নীচে কাঠের গুড়ির ওপর বসে কফি খাচ্ছো। কিন্তু যদি হিপনোসিসের মাঝ দিয়ে তোমার ব্রেইনকে বিশ্বাস করানো যায় যে, তোমাকে পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং সাঁতার না জানার কারণে তুমি পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছো, তবে তুমি মারা যাবে। এমনকি যদিও তোমার শরীরে বাহ্যিক ভাবে পানির চিহ্ন মাত্র থাকবেনা তারপরও আগামীকাল জেনেভার হাসপাতাল থেকে তোমার যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসবে সেখানে তোমার পানিতে ডুবে মারা যাবার সকল আলামত পাওয়া যাবে।

আতিকের পরের কথায় মনে হল সে প্রভাতদার কথা গুলোকে হুমকী হিসেবে নিয়েছে,
-আপনি হিপনোসিসেও বিশ্বাস করেন। আপনার সাইন্স ছেড়ে ফিলসফির হাবিজাবি ধরা উচিৎ।
প্রভাতদা বললেন,
-হিপনোসিস নিউরো-সাইন্সে পরীক্ষিত একটি বিষয়। ঠিক আছে, তোমার বোধগম্য সাইন্স দিয়েই বিষয়টি ব্যাখ্যা করি। বস্তু, বাস্তবতা, বস্তুগত পার্থক্য এবং তোমার কন্সাসনেস বা বোধ সবই একসূত্রে গাঁথা। সমস্যা হল, আমাদের ব্রেইন পারিপার্শ্বিকতা তৈরী করে চলেছে এই বিশ্বের চতুর্মাত্রিক আইন মেনে নিয়ে। খুব সহজ আইন দিয়ে বলি, একটি শিশুর জন্ম কিছু নিয়মের মাঝে সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার বাইরে বাকি সব কিছুই আমাদের কাছে ব্যাখ্যাতীত কিন্তু তারমানে এই নয় যে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষমতাকে নিজেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন ঐসব আইনের কাছে। এর গ্রহণযোগ্য প্রমান যীশু খ্রীস্ট।

আতিক বললো,
-আপনি বিজ্ঞানের মাঝে ধর্মকেও টেনে আনবেন নাকি?
প্রভাতদা বললেন,
-বিজ্ঞান আবার কবে ধর্মকে অতিক্রম করে গেলো? ঠিক আছে, বিশুদ্ধ প্রমাণীত বিজ্ঞানের কাছেই যাচ্ছি, তবে তার আগে এই প্রসঙ্গটা শেষ না করলে আগামীকালের এক্সপেরিন্টটা তোমার ভাইকে বোঝাতে আমাকে অনেক বকর বকর করতে হবে।

এবার আতিক উঠে দাঁড়িয়ে বললো,
-এতোক্ষণে বুঝলাম আপনি আগামীকালের এক্সপেরিমেন্টের প্রস্তুতি আলাপ করছেন। আগামীকাল আমার সকাল এগারোটায় ভীষন জরুরী মিটিং, চাইনীজ ইনভেস্টর গ্রুপের সাথে। রাত বাজে প্রায় দু'টা। আমাকে একটু বিশ্রাম নিতেই হবে। আজ এটুকুই থাকুক।

এই আলো আঁধারীর কুহেলিকার মাঝে প্রভাতদা আতিকের চেহারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আতিকের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সেটাই হয়তো বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার চেষ্টা করলেন। সত্যি বলতে কি আতিকের কন্ঠের তীক্ষ্ণতা আমার কানেও লেগেছে। কিন্তু অপরিচিত বিদেশ বিভুঁইয়ে বাহন একটা মারাত্মক সমস্যা। প্রায় অপরিচিত একজন আধ পাগল সাইন্টিস্টের উপর আস্থা রাখার চাইতে নিজের ভাইয়ের উপর আস্থা রাখার জন্য আমার অবচেতন মন গুতোগুতি শুরু করলো বোধহয়। সেজন্যই হয়তো আড্ডাটি এবং আড্ডার পরিবেশটি আমার যতই ভাল লাগুক না কেন, আমি আর কথা না বাড়িয়ে ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,

-দাদা, আগামীকাল প্রচুর সময় পাওয়া যাবে, বাকিটা কালকেই হবে।

প্রভাতদা খুব নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,
-হ্যা, আগামীকাল আমাদের অফুরন্ত সময়, নো প্রবলেম। আমি ফর্মালিটিজ সব শেষ করে সকাল সারে নয়টা থেকেই তোমার ভাইয়ের অপেক্ষায় থাকবো। তুমি কাছাকাছি এসে আমাকে জানালে আমি নিজেই রিসিভ করবো।

বিদায় পর্বে বেশী সময় নষ্ট হল না, গাড়িতে উঠেই আতিককে বললাম,
-তোর ব্যবহার খুব রুক্ষ হয়ে গিয়েছে।
আতিক বললো,
-আর বলো না। দুর্ঘটনায় ওনার ফ্যামিলি মারা যাবার পর থেকে উনি কেমন যেনো একটু আউলা ঝাউলা হয়ে গিয়েছেন। কখন কি বলেন, কি করেন কেউ জানে না। ওনার লোকাল কন্টাক্ট পারসন হিসেবে সার্নে আমার নাম দেয়া আছে। সময় নেই অসময় নেই ওনার খোঁজে সার্ন থেকে আমাকে ফোন দেয়। এর মাঝে তুমি আসবে এটা নিয়ে উনি ছেলে মানুষের মত এক্সাইটেড। কাল রাত দু'টোর সময় বাসায় এসে হাজির। এসব ছেলেমানুষী কতক্ষণ সহ্য করা যায়।

আমি আর বেশী কথা বাড়ালাম না। রাত শেষ হ'য়ে তখন প্রায় ভোর। আতিকের বাড়িটায় আমাকে যে রুমে থাকতে হয় সেটা রাস্তার পাশেই। এখানে কেউ হর্ন না বাজালেও খুব সকালে গাড়ির শব্দেই ঘুম ভাঙ্গে সাধারণত। আজও তার ব্যতিক্রম হল না, আমি আতিককে না ডেকে নিজেই ধীরে সুস্থে তৈরী হচ্ছি। আমার ধারনা ছিল সকাল নয়টার দিকে রওনা হব। কিন্তু আতিক সারে আটটায় এসে বললো,
-সার্ন প্রায় চল্লিশ মিনিটের ড্রাইভ, এখনই রওনা হতে হবে।
আমিও রেডি। চললাম সার্নের পানে।

**<u>সার্নের গপ্পো</u>**

"সার্ন"! বর্তমান বিজ্ঞানের জগতে বহুল আলোচিত একটি নাম। আমার কখনো দেখার সৌভাগ্য হবে সেটা যদি আমাকে মাস খানেক আগেও কেউ বলতো আমি বিশ্বাস করতাম না। আজ তার সামনে দাঁড়ানো আমি। আতিক আগেই প্রভাতদার আফিসে ফোন দিয়ে জানিয়ে রেখেছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে বড় একটা শ্বাস টেনেছি কেবল, প্রভাতদা হাসি মাখা মুখে বেরিয়ে এসে বললেন,
-জাস্ট অন টাইম। আতিক এক কাপ সার্নের সাইন্টিফিক কফি খেয়ে রওনা হও।

হয়তো গতকালের রুক্ষ ব্যবহারে আতিক নিজেই অনুতপ্ত অথবা বাসা থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরুবার কারণে চা-নাস্তা করতে পারেনি বলে আতিক ঝটপট রাজি হয়ে গেল। সার্নে মোবাইল নিষিদ্ধ, ঢুকবার সময়ই সবার মোবাইল জমা দিতে হল। ক্যাফেটেরিয়ায় যেতে যেতে প্রভাতদা বললেন,
-যে কোন অর্গানাইজেশনের ক্যাফেটারিয়া তার আভিজাত্যের প্রতীক। আমাদের ক্যাফেটারিয়া নিয়ে আমাদের সার্নের সবাই গর্বিত।

আসলেই গর্ব করার মত ক্যাফেটারিয়া। বিশাল ক্যাফেটারিয়ার টেবিল গুলো এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে, এক টেবিলে বসলে অন্য টেবিল চোখেও পরবে না, কথাও শোনা যাবে না। কিন্তু মানুষজনের দেখা মেলা ভার। এতো বড় অর্গানাইজেশন, এত্তো এত্তো স্ট্রাকচার কিন্তু মানুষ নেই বললেই চলে। পরে মনে হল,

হয়তো আজ রবিবার বলেই মানুষ কম। একদিকে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন ধরনের খাবারের বক্স, ফলের রস, চা-কফি কি নেই। আমি ওখান থেকে ম্যাকারেল সালাদ আর কফি নিয়ে বসলাম। আতিক শুধুই এক কাপ কফি নিল। কথা বলা শুরু করলেন প্রভাতদা নিজেই,

-আপনার সার্নের সাইন্টিফিক টার্ম, ইকুয়েশনের কথা বুঝবার প্রয়োজন নেই। খুব সাধারন ভাষায় একটা ধারনা দিচ্ছি আমাদের সুপার কোলায়ডার ও তার কাজ সম্পর্কে। সুপার কন্ডাক্টিং ম্যাগনেট দিয়ে মোড়ানো ৭০ কিলোমিটার লম্বা এক্সিলেটরের মাঝ দিয়ে আলোর গতিতে দু'টো প্রোটনকে এনে কোলায়ডারে সংঘর্ষ করিয়ে সেকেন্ডে চার কোটি ছবি তোলা হয়। এই সংঘর্ষের ফলে বিপুল এনার্জির সাথে তৈরী হয় বিভিন্ন ধরনের পার্টিক্যাল এবং সাথে....

আমি আমার জ্ঞ্যান জাহির করার জন্যই হোক অথবা নামটি আমার অপছন্দের কারণেই হোক, বললাম, -গড পার্টিক্যাল।

প্রভাতদা আমার গলার আওয়াজের মাঝে কিছু একটা হয়তো অনুভব করেছিলেন, বললেন,
-মিডিয়া যদিও "গড পার্টিক্যাল" নামটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে বেশী কিন্তু সাইন্টিস্টরা এই নামটি পছন্দ করে না। তারা হিগস বোসন পার্টিক্যাল নামটিই প্রেফার করে। তবে হিগস কণিকা আবিষ্কারই শেষ কথা নয়, আরও মৌলিক কিছু আছে কিনা সেটা খুঁজে পাবার আগে পর্যন্ত বস্তুর একক এই হিগস কণিকাকে আমরা শেষ একক কণিকা ধরে নিয়ে, সৃষ্টিকর্তার ঘোষনা, "আমি সকল যায়গায় বিদ্যমান, শেষ বিচারে তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি ধুলি-কণা তোমার কর্মের সাক্ষ্য দেবে" কথাটিকে আস্থায় নিয়ে যদি আমরা আমাদের চারিদিকের বস্তুর সমষ্টিগত বিচার করি, তাহলে যাদের মাঝে প্রান আছে বা যে সব বস্তুর প্রান নেই, সব কিছুরই মৌলিক কণা এই "হিগস পার্টিক্যাল"। সব কিছুরই ওজন বা ভর তৈরী করছে হিগস কণিকা। ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো বোঝেনই। সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মত হিগস পার্টিক্যালের কম্পন ও ভর মিলিয়ে তৈরী হচ্ছে হিগস ফিল্ড।

আতিকের সময় কম। কফি শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে যেতেই আমি বললাম,
-আপনি যতটুকু বলেছেন এটুকু সম্পর্কে আমার একটা ধারনা আছে। আমি একটা বিষয় কিছুতেই বুঝিনা, জীবন বা প্রানের সংজ্ঞা।

প্রভাতদা বললেন,
-এবার আর সাইন্সের দোহাই না, আমার নিজস্ব বিশ্বাস দিয়ে আপনার কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করি। প্রান বা জীবন শক্তি তৈরী হচ্ছে হিগস কণিকার মাঝে যে বিশাল শক্তি রয়েছে সেই শক্তি কোষের জটিল সমন্বয় প্রক্রিয়া দিয়ে। যেমন বলেছি "বোট" এর সমষ্টি দিয়ে ভবিষ্যত রোবট তৈরীর ভাবনার কথা, জীবন শক্তিও হয়তো ঠিক তেমনই একটি প্রক্রিয়া। আপনি কখনো যদি শীতের সন্ধ্যায় হাজার হাজার পাখীর কোন ঝাঁকের ওড়ার দিকে খেয়াল করেন তবে দেখবেন, তারা যখন হঠাৎ তাদের দিক পরিবর্তন করে, তখন কোন এক অদৃশ্য শক্তিতে মাইল লম্বা পাখির পুরো ঝাঁকের দিক পরিবর্তন করতে আধা সেকেন্ডও লাগেনা। এই সমষ্টিগত ঐক্য প্রক্রিয়াকে একটি প্রানীর বহু কোষের সমন্বয়ে গঠিত দেহের কর্ম প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করলে একটা দিগনির্দেশনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। সত্যি বলতে কি, আপনার সার্নে আসবার দু'টি কারণের মাঝে অন্যতম "জীবন শক্তি" খুঁজে বের করার চেষ্টায় আমার একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলতে পারেন।

এবার বুঝলাম আতিকের কথাই ঠিক। ভদ্রলোক পাগল হ'য়ে গিয়েছেন ভাবনাটি যে মুখ ফস্কে বেড়িয়ে এলো সেটাতে আমার নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রন ছিল না, বললাম,
-আপনি পাগল নাকি। আমার মত মূর্খ মানুষ এই জটিলতার সমাধানে ভূমিকা রাখবে সেই আশা করছেন কেন?

প্রভাতদা খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন,
-আপনি মূর্খ সে কারণেই আপনাকে ডেকে এনেছি। সাইন্সের যুক্তির জগতের বাইরে যেয়ে এখন ফিলসফির কল্পনার জগতের সহযোগীতা প্রয়োজন। আমরা বহু বড় বড় ফিলসফার ডেকে এনেছি কিন্তু তারা সকলেই গতানুগতিক ভাবনার বাইরে যেতে পারছেন না। আপনার কিছু ভাবনা আছে এবং আপনার ভাবনা গুলোকে আমার গতানুগতিক মনে হয়নি এবং আপনার ভাবনা নিয়ে আপনাকে কোন ক্রিটিসিজম সহ্য করতে হবে না। আপনার প্রধান ঢালই বলেন আর সম্ভবনাই বলেন, সেটা হল, এই বিষয় গুলোতে আপনার যথেষ্ঠ জ্ঞান না থাকলেও নিজস্ব কিছু ভাবনা আছে। আপনাকে আমি কিছু তথ্য উপাত্ত দেবো, তারপর আমরা জীবন-মৃত্যুকে ডিফাইন করার চেষ্টায় চলে যাবো আমার এক্সপেরিমেন্টে। প্রথম কথা, আপনি যে জগতটা দেখছেন সেই একই জগত কি এই বিশ্বের অন্যান্য প্রানীও একই ভাবে দেখছে কিনা।

আমি কিছুটা ইতস্তত ভাবে বললাম,
-রঙ গুলো হয়তো এক ভাবে দেখছে না কিন্তু বাকি সব তো মনে হচ্ছে একই রকম ভাবে দেখছে। একটা বেড়ালের দুধ পছন্দ সেটা আমার জানা আছে। বেড়ালকে তো আমি দুধের বদলে পানি দিচ্ছি না এবং আমি যেটাকে দুধ হিসেবে দিচ্ছি সেটাকে তো বেড়ালটাও দুধ হিসেবেই পছন্দ করছে কিংবা বেড়ালকে লম্বা চোঙ্গা পাত্রে যদি দুধ খেতে দেয়া হয় তবে সেও তো সেখানে মুখ ঢোকাতে পারছে না।

প্রভাতদা বললেন,
-ভাল যুক্তি কিন্তু আপনি নিজেই বললেন যে, বেড়ালের দেখা রঙ আর মানুষের দেখা রঙ এক নয়। তারমানে মানুষের যৌক্তিকতার কিছু একটার সাথে বেড়ালের যৌক্তিকতার কিছু একটার মিলনে তার পছন্দ অপছন্দ মানুষ বুঝে নিচ্ছে। ঠিক একই ভাবে পাত্রের আকারও যে পরিবর্তিত হতে পারে, সেটাও তো যৌক্তিক। আমরা এখনো জানিনা, অন্যান্য প্রানীও কি মানুষের মতই ত্রিমাত্রিক জগতে বাস করে নাকি তারা দ্বিমাত্রিক বা অন্য কোন মাত্রায় বসবাস করে।

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম,
-আপনি বললেন আপনি আমার সব লেখা পড়েছেন, তাহলে তো আপনি আমার বিশ্বাস জানেন যে, আমরা চতুর্মাত্রিক জগতে বসবাস করছি।

প্রভাতদা কথা বাড়তে না দিয়ে বললেন,
-দুঃখিত। হ্যা, আমি জানি আপনার বিশ্বাসের কথা। আমরা অবশ্যই চতুর্মাত্রিক জগতে বাস করছি। আলো কোন বস্তুর ওপর প্রতিফলিত হ'য়ে আমাদের একটা ছবির পারসেপশন তৈরী করে দেয়। যদি পানির মধ্য দিয়ে অলোর গতি পরিবর্তিত করা হয় তবে ছবিটির পারসেপশনও পরিবর্তিত হয়। এটা আর কিছুই নয়, আলো কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসতে "সময়" নামের মাত্রাটির যে তারতম্য ঘটে সেটার কারণেই এই অবস্থা। সুতরাং, সময় নামের আরেকটি মাত্রার মাঝে আমরা অবশ্যই আছি এবং ঐ মাত্রাটি তৈরী হচ্ছে আলোর গতির মাধ্যমে। যদি একটি বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত না হয়

তবে সেই বস্তুও আমাদের কাছে অস্তিত্ব হীন। আইনস্টাইন মহোদয় কিছুটা ঝামেলা পাকিয়ে রেখেছেন, উনি বলে দিয়েছেন, আলোর গতির কাছে এই মহাবিশ্বের “সময়” নামক মাত্রাটি নির্ভরশীল। যদিও তার একটি কথা এখন আর প্রযোজ্য না। তিনি বলেছিলেন, এই মহাবিশ্বে আলোর গতিই শেষ কথা, এটাই এই মহাজগতের আইন, আলোর গতিকে অতিক্রম করা এই মহাবিশ্বের চতুর্মাত্রিক আইনের পক্ষে সম্ভব না, ওটা অন্য কোন মাত্রার জগতে হয়তো সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হল, কোয়ান্টাম থিয়োরেটিক্যাল পার্টিক্যাল “ট্যাকিওন” আলোর গতিকে অতিক্রম করেছে।

আমি আবার বাধা দিতে বাধ্য হলাম, বললাম,
-আপনিই বললেন “ট্যাকিওন” পার্টিক্যাল থিয়োরিটিকাল। ওটার আবার প্র্যাকটিক্যাল অস্তিত্ব আছে নাকি।

প্রভাতদা বললেন,
-ধরে নিন আছে। প্রায় দশটা বেজে গিয়েছে। আপনার ভাবনা সংক্রান্ত আর একটা বিষয়ে আলাপ করেই আমরা সার্ন পরিদর্শনে বেড়িয়ে পরবো। আপনি আপনার লেখায় ইগো’র ডেফিনেশন দিতে যেয়ে ব্রেইনকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একভাগের নাম দিয়েছেন “যৌক্তিক” মাত্রা আরেক ভাগের নাম দিয়েছেন “আবেগীয়” সত্বা এবং দুই ভাগ মিলে আরেকটা ব্যাখ্যাতীত কোন কিছুকে বুঝিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে প্রতি ক্ষণে, সেই ব্যাখ্যাতীত কিছুকে আপনি বলতে চাচ্ছেন “আমি” বা ইগো। আমার আপত্তি নেই আপনার ব্যাখ্যায়। কিন্তু আজকের “সার্ন” পরিদর্শন সাক্সেসফুল করার জন্য আপনার ভাবনার দূয়ার উন্মুক্ত ক’রে একটু অন্য ভাবেও ভাবতে আনুরোধ করবো।

আমি বললাম,
-আমি খোলা মন নিয়ে বসে আছি, আপনি শুধু সূত্রটা ধরিয়ে দিন।

প্রভাতদা শুরু করলেন,
-ফিলসফিটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যাক, আপনার কন্সাসনেস বা বোধটাকেই এখানে মূল ধরে নিন, যেটার সাথে তুলনা করতে পারেন কম্পিউটারের র‍্যাম কে, আপনি যাকে "যৌক্তিক" ভাগ বলছেন। মানুষের এই কন্সাসনেসের কাছেই ব্যাখ্যা করা আছে চতুর্মাত্রিক পৃথিবীর যাবতীয় আইন-কানুন। কিন্তু কোয়ান্টাম লেভেলের কিছু দ্বিতীয় অদ্ভুত গোলমেলে আচরন মানুষের কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। যেমন ধরুন,

১) পরমানুর বা কণিকার সুপার পজিশন, অর্থাৎ, একই সময় একটি কণিকা দুই যায়গায় অবস্থান করতে পারে, ততোধিক শব্দটি এখনও ব্যবহার করবার সময় আসেনি।
২) পদার্থের কোয়ান্টাম লেভেলের, এন্টাংঙ্গেল্ড দু’টো কণিকার ঘুর্নয়মান আচরন পুর্ব নির্ধারিত। অর্থাৎ, একজন যদি উপরে-নীচে ঘুর্নয়মান থাকে তবে আরেকজন উল্টোদিকে নীচে-ওপরে ঘুরবেই, দুরত্ব এখানে বিষয় নয় এবং মনে হবে যেন সবই পুর্বনির্ধারিত।
৩) পর্যবেক্ষণের সাথে সাথেই কোয়ান্টাম লেভেলের কনিকা গুলো শক্তির ওয়েভ ফাংশন প্রক্রিয়া ছেড়ে পদার্থের মত আচরন শুরু করে, যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি "পার্টিক্যাল ডুয়ালিটি"। অর্থাৎ, কোয়ান্টাম লেভেলে বিশ্বের তাবৎ বস্তু, পর্যবেক্ষণ ছাড়া একটি শক্তি কিন্তু পর্যবেক্ষণের সাথেই সাথেই সেই একই শক্তি বস্তুর মত আচরন করছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এইসব অদ্ভুত আচরনের কারণে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম ফিজিক্স পছন্দ করতেন না, বলতেন, ভুতুরে। আপনি ম্যাট্রিক্স মুভিটি দেখেছেন কি?

আমি বললাম,
-আমার খুব প্রিয় একটি মুভি। বিশেষত প্রথম পর্বটি, যদিও সব বুঝেছি সেটা বলা যাবে না।
উনি বললেন,
-বুঝবার দরকার নেই। পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ প্রায় অনেক কিছু না বুঝেই মুভিটিকে পছন্দ করেছে। আমি শুধু একটি দৃশ্যের কথা বলবো। দৃশ্যটি অনেকটা এরকম, নায়ককে একটি বাচ্চা মংক একটি চামচ হাতে দিয়ে বললো, তোমার মনের শক্তি দিয়ে চামচটি বাঁকিয়ে দাও। নায়ক চামচটির দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকবার পর মংক বললো, তুমি চামচটি বাঁকাবার চেষ্টা করছো। নায়ক বললো, তাহলে কি করবো। মংক বললো, আগে চামচটির অস্তিত্ব অস্বীকার কর, মনে কর চামচটি নেই, এটা যখন সাক্সেসফুলি করতে পারবে তখন তুমিই চামচটির অস্তিত্ব, তুমি বাঁকা হলে চামচটিও বেঁকে যাবে।

আমি বললাম,
-ঠিক মনে পরছে না দৃশ্যটি। এধরনের অদ্ভুত দৃশ্যের ছড়াছড়ি রয়েছে মুভিটিতে। কিন্তু আপনি এই প্রসঙ্গটি এখানে আনলেন কেন?

প্রভাতদা আমার কথার উত্তর না দিয়ে উঠে হাঁটা শুরু ক'রে বললেন,
-আপনি যদি নিজেকে কোন ভাবে কোয়ান্টাম লেভেলে নিয়ে গিয়ে "সাবকন্সাস" মাইন্ডের কাছে যেতে পারেন তখন হয়তো আপনার কাছে সৃষ্টির মৌলিক আইন গুলো পরিষ্কার হ'তে পারে। যাক, এবার চলুন আমরা বেরিয়ে পরি সার্ন পরিদর্শনে। যেতে যেতে মহাজাগতিক বিষয়ে একটা শুধু ফিলসফি বলে যাই। সার্নে আমার কর্ম ব্ল্যাকহোল সংক্রান্ত। এই দু'টোর ব্যাখ্যা তো আপনার জানাই আছে।

আমি বললাম,
-খুব ভাসা ভাসা জ্ঞ্যান আমার। এটুকু বুঝি যে, ওটা এখনো থিয়োরি। "ব্ল্যাকহোল" বলতে বুঝি, বিশাল ভর সম্পন্ন নক্ষত্র যেটার ভর এতো বেশী যে, তার আশেপাশে কিছু যদি যায় তবে আর রক্ষা নেই, বেরিয়ে যেতে পারবে না, এমনকি আলোক কণিকাও না। আর আলো যেহেতু এই মহাজগতে সময়ের পরিমাপক ভিত্তি, সে কারণে সময়ও সেখান স্থির বা অন্য আইনে চলে।

প্রভাতদা ততক্ষণে লিফটের সামনে এসে গিয়েছেন। বললেন,
-এটুকু বুঝলেই হবে, তবে ব্ল্যাকহোলের ভাবনাকে শুধু চুড়ান্ত ভর সম্পন্ন নক্ষত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখবেন না, এটার অস্তিত্ব যে কোনখানেই থাকতে পারে।

ততক্ষণে আমার আর কোনদিকেই খেয়াল নেই। সার্নের বিশালত্ব আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ফেলেছে। আমি সেই বিশালত্ব গিলছি। কি দেখছি আমি নিজেও জানি না কিন্তু দেখছি। বাস্তবিক অর্থেই মুখ "হা" করে সার্নের বিশাল সুপার হেড্রন-কোলায়ডারের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। সার্নের সব কাজকর্ম নিয়ে এবং হেড্রন কোলায়ডার নিয়ে বকেই চলেছেন প্রভাতদা কিন্তু আমার কানে কিছুই যাচ্ছে না। এরই মধ্যে হাজির হলাম দু'টো প্রোটনকে যেখানে এনে সংঘর্স কারানো হয় সেই চেম্বারটিতে, ক্যামেরা লাগিয়ে এটমিক কলিশনের ছবি তোলার ব্যবস্থা গিলছি। কোন সময় যে সার্নের ইনডোর ইলেকট্রিক গাড়িতে চড়ে বসেছি জানি না। তারপর আবার একটি লিফট। আরও নীচে, অনেক নীচে নেমে এলাম লিফটে চড়ে। সামনে অদ্ভুত এক কাঁচের বিশাল কক্ষে বেশ কিছু মানুষ কম্পিউটারে কাজ করে চলেছেন। সেই ঘরের কম্পিউটার গুলো এবং নানা রকম লাল নীল আলোর সুইচ আমাকে সাইন্স ফিকশনের জগতে নিয়ে

গিয়েছে ততক্ষণে। কক্ষটির একদিকে কাঁচের ঘরের ভেতর আরেকটি মোটামুটি তিন ফুট ব্যাসের একটি গোলাকার বৃত্ত। রঙ দেখে মনে হল তামার তৈরী।

বড় কাঁচের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদা ঘোষনা দিলেন,
-আমি আমার গবেষণার যায়গায় চলে এসেছি। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই সকলের সাথে।

তারপর জার্মান ভাষায় কি সব বললেন, সকলে এসে হাসি মুখে আমার সাথে হাত মেলালো। আমিও আমার হাসিটা ঠোঁটের কোনে ধরে রাখার প্রানপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রথমত, আমি হতবিহবল ঘর খানা দেখে। মাটির এতো নীচে এরা এখানে কি করছে? দ্বিতীয়ত, দাদার গতকালের কথায় মনের মাঝে একটা সন্দেহ কাজ করা শুরু করেছে যে, আমি বোধহয় কোরবানীর গরু হতে চলেছি। বিশেষ করে এতো বড় বড় সাইন্টিস্ট গুলো আমার সাথে অতিরিক্ত আন্তরিকতা দেখানোতে সন্দেহটা আরও প্রবল হয়ে উঠলো। আমি খুব সাবধানে ধীর ভঙ্গীতে ঠোঁটের কোনের হাসিটা ধরে রেখে দাদাকে বললাম,
-সারে বারোটা বেজে গিয়েছে। আতিকের আসবার সময় হয়েছে। চলুন লাঞ্চটা সেরে আসি।
প্রভাতদা আমার কথাকে পাত্তাই দিলেন না। বললেন,
-আধা ঘন্টা তো প্রচুর সময়। আমরা আজ এক্সপেরিমেন্টটা আপনাকে নিয়ে করেই তবে যাবো।

নাহ, এবার ঠোঁটের কোনের হাসিটা আর ধরে রাখা যাচ্ছেনা মনে হল, বললাম,
-আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট মানে কি বুঝলাম না।

প্রভাতদার পরের কথায় মনে হল আমার নার্ভাসনেসের কথা বুঝে ফেলেছেন। ছোট গোলকটিতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,
-এক্সপেরিমেন্টে সব সময়ই অনিশ্চয়তা থাকে। আমাদের এক্সপেরিমেন্টে ভয়ের কিছু নেই বলবো না, তবে দু'টি বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারি আপনাকে, আমরা কোনও দূর্ঘটনা ছাড়াই আগেও একই এক্সপেরিমেন্ট বহুবার করেছি এবং প্রতিবারের মানুষ সহ এক্সপেরিমেন্টের মত এবারও আমি আপনার সাথেই থাকবো। আমি সাথে না থাকলে আপনার অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্য গুলো নিশ্চিত করবো কি ভাবে বলুন, তাছাড়া এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়ে আপনার মনে যদি কোন প্রশ্ন জাগে সেটার উত্তর দেবে কে?

আমি কিছুটা লজ্জা পেয়েই বললাম,
-নাহ ভয় নয়, সময় খুব কম তো, সে কারণেই বললাম।

**<u>যন্ত্রের গপ্পো</u>**

প্রভাতদা খুব ব্যস্ত, কোন উত্তর না দিয়ে আমাকে সহ কাঁচের ছোট ঘরটায় ঢুকলেন, তারপর নিজের মাথায় এবং আমার মাথায় হেলমেটের মত একটা পরিয়ে দিতে দিতে বললেন,
-প্লিজ ইনিশিয়েট দা সিকুয়েন্স।

পেছনের দরোজাটি বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপরই আমাকে বললেন,
- আপনার হেলমেটের গ্লাসে ভেসে আসা ঘড়িটি এটমিক ঘড়ি। ঘড়িটিতে ক'টা বাজলো দেখুন।

আমি কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালাম। কিন্তু প্রভাতদা নাছোড় বান্দার মত বললেন,

-এখন ক'টা বাজে বলুন তো,
আমি বললাম,
-১২ঃ৩৫ঃ২৭ঃ----
প্রভাতদা বললেন,
-সেকেন্ডের পরের চারটা ঘর খুব দ্রুত চলছে, ওটা এখন দেখলেও বুঝতে পারবেন না। ওটা সেকেন্ডের হাজার ভগ্নাংশের ঘর। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে আমাকে ফাইনাল রিডিং বলবেন।

কথা বলা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ প্রভাতদা আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে সহ গুটিশুটি মেরে বসে বললেন,
-হ্যা, এখন সময় কত বলুন।
আমি বললাম,
-১২ঃ৩৫ঃ৩১

ব্যাস, তারপরই বিশাল এক আলোর ঝলকানীতে চোখ মনে হল ঝলসে গেল, এরপরই চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার, সব শুন্য। নিজেকেও কেমন যেন ওজন শুন্য মনে হল। হঠাৎ প্রভাতদার গলার শব্দ ভেসে এলো। কোথা থেকে বুঝবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মাথায় লাগানো হেলমেটটা স্পর্শ করলাম, দেখি শুন্য, আমার হাতই আছে কিনা বুঝতে পারছিনা। অনেকটা মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের ঘোরের মাঝে আছি। প্রভাতদা বলছেন,
-আমার কথা শুনতে পেলে বলুন।

আমি বললাম,
-শুনতে পাচ্ছি কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা, অনুভুতি গুলোও কেমন যেন দুর্বোধ্য লাগছে। বেঁচে আছি তো আমি।

প্রভাতদা বললেন,
-সেটাই তো আমরা এখন খোঁজার চেষ্টা করবো, বেঁচে আছি কিনা আমরা। তবে আগের প্রতিবারই আমি এখান থেকে জীবিত ফিরে গিয়েছি, সুতরাং, নিশ্চিত থাকার চেষ্টা করুন যে, আমরা বেঁচে আছি। গতকাল রাতে আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে তারপর এক্সপেরিমেন্টটায় আনতে চেয়েছিলাম কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা হয়ে ওঠেনি। এখন আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবো, তারপর আমরা আলোচনা করবো আমরা কোথায় আছি, কোন অবস্থায় আছি।

আমি বললাম,
-আতিক এসে তো বসে থাকবে।
উনি বললেন,
-নো টেনশন। আমরা এখানে যতক্ষণ সময়ই কাটাইনা কেন, যদি ফিরে যেতে পারি তবে দেখবেন আতিকের আসতে তখনও অনেক বাকি।

এই কথায় আমি নির্বাক, হতবাক। বলে কি লোকটা, "যদি ফিরে যেতে পারি" মানে কি। আমার মনের অবস্থা কিভাবে বুঝতে পারলেন প্রভাতদা জানি না কিন্তু সাথে সাথেই তার কথা যেন ভাসতে ভাসতে আমার কানে এসে পৌঁছালো,

-আপনাকে কিছু ব্যাখ্যা না দিলে আজকের এই এক্সপেরিমেন্টে আপনি প্রান হারাতে পারেন। আমি আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে তারপর আজকের এই এক্সপেরিমেন্ট শুরু করতে চেয়েছিলাম কিন্তু গতকাল আতিকের অসহিষ্ণুতার কারণে প্রায় কিছুই বলা হয়নি। পরে মনে হল, আপনি জীবনে প্রচুর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে এসেছেন, নতুন কে জানার একটা আগ্রহ আপনার মাঝে আছে, তাই ভাবলাম, সবকিছু জানলেও আজ আপনি আপত্তি করবেন না। এর আগে পৃথিবী বিখ্যাত তিনজন ফিলসফারের সাথে সবকিছু আলাপ করে অফার করেছিলাম আমার সাথে এই এক্সপেরিমেন্টে অংশ নেবার জন্যে, সব শুনে তার সবাই ঘাবড়ে গিয়েছেন। তাদের একজনই শুধু একবার চড়েছেন এই যন্ত্রটিতে, আর একজন পদার্থবিদও এসেছেন। আমার এটা সপ্তম ভ্রমন। আপনার কিছু জানা না থাকায় সুবিধা হবে একটা, আপনার আনকোড়া অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কিছু আমরা পেয়েও যেতে পারি। আপনি শুধু আমার অভিজ্ঞতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকুন।

এবার আমি ঘাবড়ে গেলাম। বলে কি ভদ্রলোক। এতোদিন আমার ধারনা ছিল বিজ্ঞানের প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিত পদক্ষেপ। সেখানে উনি কিনা বলছেন নিশ্চিত ভাবে কিছুই জানেন না। আমরা কি ধরনের যন্ত্রের মাঝে আছি সেটা উনি জানেন কিনা সেটা নিয়েও আমার সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। আবারও আমার অবাক হবার পালা। উনি মনে হল যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন, বললেন,

-আপনাকে যন্ত্রটি সম্পর্কে এবং আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা দেবো। তার আগে কিছু সতর্কবাণী শুনে রাখুন। এখানে সব কিছুই আপনার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। হঠাৎ কিছু ঘটলে ঘাবড়ে যেয়ে আজেবাজে কোন কিছু ভাবতে শুরু করলে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এটুকু ছাড়া আপনি আপনার ভাবনার ডানা মেলে দিন আপত্তি নেই, হাত পা ছড়িয়ে দিন, লম্ফঝম্প করুন কোন সমস্যা নেই কিন্তু কোন কিছু ধরবার চেষ্টা করবেন না, কোন কিছু বলতে আমি আপনার শরীরকেও বুঝাচ্ছি। অনুভূতি গুলোকে শুন্য করে দেবেন না, স্বপ্নের জগতে আছেন মনে করে ঘুমিয়ে পরবেন না। এই যন্ত্রে আমি নিজে ওঠার আগে আমরা ছোটখাটো বস্তু দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিলাম, বস্তু গুলো প্রথম দিকে আর ফিরে আসতো না, হারিয়ে যেতো। পৃথিবীর একটা নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পন আছে জানেন কি?

আমি বললাম,
-হ্যা জানি এবং এটাও পড়েছি যে, প্রতিটি জিনিষ এবং প্রানীরও নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি আছে। এমনকি প্রতিটি গ্রহ এবং নক্ষত্রের আলাদা কম্পনাঙ্ক আছে।

প্রভাতদা হেসে দিয়ে বললেন,
-তাহলে তো আপনি একেবারে মূর্খ মানুষ নন। আপনার জ্ঞ্যানের সাথে যোগ করুন, এমনকি মহাজাগতিক ফ্রিকোয়েন্সিও আলাদা, যে কারণে অনেকেই বিশ্বাস করেন, আমাদের এই মহাজগতের নিজস্ব কনসাসনেস বা বোধ আছে, অর্থাৎ, মহাজগত জীবন্ত। যাক, যন্ত্রের কথায় ফিরে আসি। এই যন্ত্রের কিন্তু কোন নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি নেই। যন্ত্রটি একেক সময় একেক ফ্রিকোয়েন্সিতে ওঠা নামা করে। যন্ত্রটিতে পাঠানো জিনিষ গুলো আমরা আগে ফিরিয়ে আনতে পারতাম না। পৃথিবীর ফ্রিকোয়েন্সি ৭.৮৩ তে যন্ত্রটির ফ্রিকোয়েন্সি এলাইন করার সাথে সাথেই যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ করার ব্যাবস্থা নেবার পর থেকে এক্সপেরিমেন্টে পাঠানো বস্তুগুলোকে আমরা ফিরে পেতে শুরু করলাম। এরপর আমরা বিভিন্ন প্রানীকে যন্ত্রে চড়িয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা শুরু করলাম। সমস্যা দাঁড়ালো, প্রানী গুলোকে

আমরা কখনোই জীবিতাবস্থায় ফেরত আনতে পারিনি। দেখা গেল, সবাই হৃদযন্ত্র থেমে যাওয়ায় মারা যাচ্ছে।

প্রানী গুলো মারা যাচ্ছে জানার পর আমি নিজের জীবন সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অজানা আশংকায় জানতে চাইলাম,
-আপনারা কি শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয়টি মাথায় রেখেছিলেন?
উনি বললেন,
-বাহ, আপনি তো সাইন্টিস্টের মতই ভাবতে শুরু করেছেন। হ্যা, মাথায় ছিল। আপনার মাথায় যে হেলমেটটি আছে সেটাতে ছোট্ট একটা অক্সিজেন চেম্বার আছে, দুই মিনিট পর্যন্ত আপনাকে সাপোর্ট দেবে।

এবার আমার আকাশ থেকে পরার অবস্থা হল, পেটের মাঝে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠলো, দুই মিনিট তো কখন শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে কি আমি মৃত অবস্থায় ফেরত যাবো নাকি ভাবতে না ভাবতেই দেখি কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাতদার গলার শব্দ ভেসে আসলো,
-বললাম না ঘাবড়ে যাবেন না। আপনার অক্সিজেন প্রচুর রয়েছে। দুই মিনিট বিশাল সময়, এটা প্রমানীত। অতীতে আমরা দেখেছি, অক্সিজেনের ব্যবহার হয়েছে কি হয়নি বোঝার উপায় নেই। আমরা এখানে যত সময়ই কাটিয়েছি বলে মনে হোক না কেন, যন্ত্রটির পৃথিবীর ফ্রিকোয়েন্সিতে যেতে আমাদের পৃথিবীর সময় অনুযায়ী এক সেকেন্ড সময়ও কখনোই লাগেনি।

আমি বললাম,
-এবার কিন্তু গত রাতে আতিকের বলা কথাটাই মনে পরছে, আপনি গাঁজা খান নাকি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমরা অনন্তকাল ধরে এই যন্ত্রের মধ্যে আছি।

উনি বললেন,
-গাঁজা কিন্তু ব্রেইনের একটা অংশের, মানে, ভাবনার অংশের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং আপনার ব্রেইনের "সময়" সংক্রান্ত অংশটিকে স্লো করে দেয়, যে কারণে ঐ অবস্থায় মানুষ ভাবনায় লম্বা সময়ের জন্য যা ইচ্ছে তৈরী করতে পারে। আসলে এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কথা বলতে থাকলে আমরা কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারবো না। আমি আপনাকে সাইন্টিফিক বা ম্যাথমেটিকাল ব্যাখ্যার জটিলতায় টেনে নেবো না। আমার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আপনাকে একেবারে বেসিক যায়গাটুকু সম্পর্কে ধারনা দেবো। এরপর আপনার নিজস্ব মতামত এবং ফিলসফি নিয়ে আলোচনা করে একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করবো। যদি আলোচনা শেষ হবার আগেই কোন কারণে আমাদের যন্ত্রটি পৃথিবীর ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে যায় এবং আমরা যদি বেঁচে থাকি তবে আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, আলোচনা চলবে।

বাঁচা মরার প্রসঙ্গ আসতেই আবার আমার কেমন যেন হাঁসফাঁস অবস্থা তৈরী হল। মনে হল আমি মারা যাচ্ছি, আর কখনোই আমার প্রিয় মুখ গুলো দেখতে পারবো না। প্রথমেই আমার বড় ছেলে রাইয়ানের চেহারাটা ভেসে এলো চোখের সামনে, তারপর ছোট ছেলে আজমাইন এবং একে একে বহু ঘটনা ভেসে যেতে লাগলো। প্রভাতদা বলে উঠলেন,
-বললাম না, আজেবাজে চিন্তা ছাড়ুন, আমার কথার সাথে থাকুন। নাহ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আগে আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটু না বললে আপনি একটা দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে ছাড়বেন না। আপনি এখানে এসে যে সুইচ গুলো দেখেছিলেন সেগুলোর কিছু স্পর্শ করতে পারছেন কি এখন?
আমি বললাম,

-সুইচ তো দূরের কথা, আমি আমার হাত-পা-মাথাই খুঁজে পাচ্ছিনা।

উনি বললেন,
-পাবেন না। এটার ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত আমরা যেভাবে তৈরী করেছি সেটা হল, আমরা এখন কোয়ান্টাম স্টেজে আছি। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের থিয়োরী দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করুন। চতুর্মাত্রিক পৃথিবীর আইন কানুন দিয়ে বিচার করলে আর জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে হবে না, তখন আতিককে আমি কি উত্তর দেবো। আপনি আমার কথা শুধু মনযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। অন্য কিছু ভাববেন না। আমার সাথে থাকুন।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম,
-আপনার সাথে থাকবো মানে? আপনিই তো বললেন আপনি-আমি কোয়ান্টাম লেভেলে আছি। পরমানু লেভেল বললে তবুও একটা কথা ছিল। আচ্ছা আমাকে বলুন তো, কোয়ান্টাম লেভেল অর্থাৎ বস্তুর ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কণায় আমরা আছি, হাত-নাক-পা-মুখ কিছুই নেই কিন্তু তারপরও আমরা কথা বলছি কিভাবে।

উনি বললেন,
-আবারও বলছি, আমি আপনাকে যা বলবো সবই হাইপোথেটিক্যাল, কোন সাইন্টিফিক প্রমান এখনো আমাদের কাছে নেই। আপনাকে এখানে এনেইছি আউট অব ট্র্যাক কোন ভাবনা আপনার মাথায় আসে কিনা জানার জন্য। সে কারণেই বারেবারে বলছি, আপনার ভাবনার দূয়ার খোলা রাখুন।

আমি এবার রেগেই গেলাম,
-কি বারেবারে ভাবনার দূয়ার খোলা রাখুন ভাবনার দূয়ার খোলা রাখুন বলে চলেছেন। আরে দূয়ারই খুঁজে পাচ্ছি না, ওটা পাবার পর না প্রশ্ন আসবে খোলা-বন্ধের।

প্রভাতদা হেসে দিয়ে বললেন,
-রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। আপনার দূয়ার খুঁজে দেবার চেষ্টাতেই আমার অভিজ্ঞতা গুলো আপনাকে দেবার চেষ্টা করছি। ক্রমানুসারে আসলে ভাল হ'ত কিন্তু আপনি না আবার হারিয়ে যান সেই টেনশনে আলাপ গুলো কিছুটা এলো-পাথারি আলাপ হয়ে যাচ্ছে। আপনার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্র গুলো কিছুটা জানা আছে ধরে নিয়ে এই কথপোকথনের বিষয়ে আমাদের থিয়োরী বলি।
আমি বললাম,
-কেন, ধরে নেবেন কেন? আপনি যেটুকু বলেছেন তার বাইরে আমার কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্পর্কে কিছুই জানা নেই।

উনি বললেন,
-ঠিক আছে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের আলাপের বিষয় বস্তু নয়। শুধু আপনি যাতে ঘাবড়ে না যান সেকারণে, ডাবলস্লিট এক্সপেরিমেন্ট সহ সব ধরনের সাইন্টিফিক জটিলতা এড়িয়ে যেয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলছি। আলোর ক্ষুদ্রতম অংশ ফোটন কণিকা, অর্থাৎ, এনার্জি বা শক্তি গুলোর ওয়েভ আচরন কেন পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে পদার্থের মত আচরন করে এই নিয়েই বিজ্ঞানিরা এতোদিন ব্যাস্ত ছিলেন। বর্তমানে সাইন্টিস্টরা ফোটন তো বহু ক্ষুদ্র, পরমানু ছেড়ে অনু পর্যন্ত বস্তুর কোয়ান্টাম লেভেলে

একই আচরন নিশ্চিত করতে পেরেছেন। আপনাকে তো আগেই বলেছি, কোয়ান্টামের সুপার পজিশন এবং এন্টাঙ্গায়ালমেন্ট বা জোড় বাঁধার কথা।

আমি বললাম,
-হ্যা বলেছেন, কিছুটা বুঝেছি আবার কিছুই বুঝিনি।

প্রভাতদা বললেন,
-যতটুকু বুঝেছেন ওতেই আমাদের কাজ চলবে। আরেকটি কথা, কোয়ান্টাম লেভেলের সমষ্টিগত ভাবনা। এই বিষয়ে আমার ব্যাখ্যা হল, আপনি এবং আমি এখন কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেল্ড বা জোড় অবস্থায় আছি এবং সেই কারনে আপনার ভাবনা এবং আমার ভাবনা এখন এন্ট্যাঙ্গেল্ড সমষ্টিগত ভাবনার স্তরে আছে। এই যন্ত্র থেকে বের হবার পরও আপনার-আমার তথ্য আদান প্রদানে এখন থেকে কথার কোন প্রয়োজন নেই, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, শুধু আমাকে স্মরণে এনে জানতে চাইলেই তথ্যটি চলে যাবে আপনার কাছে। এই যে আপনি আমার কথা শুনছেন, আসলে এটা আপনি আমার কাছ থেকে জানতে চাইছেন তাই তথ্য গুলো আপনার কাছে চলে যাচ্ছে, ভাবনার মাধ্যমে।

আমার নিজের কাছে মনে হল আমি মোটামুটি চিৎকার করে উঠলাম,
-এটা আবার কেমন কথা। এটা কি সারা জীবনের ভাবনার এন্ট্যাঙ্গেল্ড অবস্থান?? আপনি চাইলেই আমার গোপনীয়তার সলিল সমাধি??

প্রভাতদার উত্তর শুনে মনে হল না আমার উষ্মা তাকে ছুঁতে পেরেছে,
-হ্যা, অনেকটা তাই। এপর্যন্ত এরকমটাই হয়েছে। আগে যে দু'জন আমার সাথে এই যন্ত্রে উঠেছিলেন তাদের সাথেও আমার ভাবনা জোড় ছিল ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষণ অন্য আরেকজনের সাথে এন্ট্যাঙ্গেল্ড না হয়েছি, অর্থাৎ, আরেকজনকে নিয়ে এই যন্ত্রে না ওঠা পর্যন্ত। আপনাকে নিয়ে এই যন্ত্রে ওঠার পর আগেরজনের সাথে আমার এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট আর নেই।
আমি বললাম,
-বুঝলাম আপনার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কথা গুলো বলছেন। কিন্ত আমি যেখানে আমার হাত-পা খুঁজে পাচ্ছিনা সেখানে আপনি ব্রেইন এন্ট্যাঙ্গেল্ড হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন কেন?

## অনিশ্চয়তার গপ্পো

প্রভাতদার উত্তর শুনে মনে হল উনি বেশ উৎফুল্ল, বললেন,
-কঠিন একটা প্রশ্ন কিন্ত আপনার কিছু না জানা থাকাতে কত সহজ ভাবে করলেন। এজন্যই আমার ধারনা, আউট অফ ট্র্যাক চিন্তা করতে হলে আপনার মত একজনকেই প্রয়োজন। আমি আশাবাদী আজ আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবোই, শুধু এখান থেকে প্রান নিয়ে ফিরে যেতে পারলেই হল।
আমি বললাম,
-দাদা, মৃত্যু সম্পর্কিত এই অনিশ্চয়তার কথাটা আর উচ্চারণ না করলে ভাল হয়।

প্রভাতদা বললেন,
-অনিশ্চয়তা? চতুর্মাত্রিক বিশ্বের স্পেস কি ডিফাইন্ড স্পেস নাকি? আনডিফাইন্ড স্পেসে বসবাসের অভ্যস্ততার মাঝে আপনি নিশ্চয়তা খুঁজে বেড়ানো শিখলেন কবে? আপনার ভয়, জড়তা কাটাতে ধরেই

নিন, যন্ত্রের মাঝের এই স্থানটুকুই আমাদের দু'জনের জন্য বিশ্ব বা মহাবিশ্ব বা বহুবিশ্ব, যেটা কোয়ান্টাম থিয়োরীর আইন দিয়ে পরিচালিত একটি জগত। আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটার নিশ্চিত ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই তবে "ম্যাট্রিক্স" মুভিটিকে দিয়ে একটা সহজ বোধগম্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি। আপনি যে চতুর্মাত্রিক বিশ্বে অভ্যস্ত সেই বিশ্ব আপনার নিজস্ব সৃষ্টি। আপনি যেভাবে সেই বিশ্বকে ভাববেন, বিশ্বের রূপ-রস-রঙ আপনার কাছে সে ভাবেই ধরা দেবে। আপনার মনে আছে কি "ম্যাট্রিক্স"এর সেই দৃশ্যের কথা যখন নিয়ন তার নায়ককে ম্যাট্রিক্স বোঝাচ্ছে, সে যখন যেভাবে ভাবছে সেই ভাবে তার আশেপাশের দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে।

আমি বললাম,
-হ্যা, মনে আছে।
প্রভাতদা বললেন,
-কোন থিয়োরীতে এরকম একটি দৃশ্য মুভিটিতে এলো ভেবে দেখেছেন কখনো?
আমি বললাম,
-এরকম ম্যাজিক দৃশ্যের ছড়াছড়ি ঐ মুভিটিতে। ওটার পেছনেও কোন থিয়োরী আছে নাকি?

প্রভাতদা বললেন,
-হ্যা আছে। মানুষের কন্সাসনেস বা বোধের দু'টি ভাগ আমরা করেছিলাম, "বোধ", অর্থাৎ, "কন্সাস মাইন্ড", আপনি যেটাকে বলেছেন "যৌক্তিক" মাত্রা এবং "অন্তর্বোধ" অর্থাৎ, "সাবকন্সাস মাইন্ড", আপনি যেটাকে বলেছেন "আবেগীয়" সত্বা। আমাদের এই বিশ্বে "বোধ" কে গড়ে তোলা হয়েছে চতুর্মাত্রিক আইন দিয়ে, কিন্তু "অন্তর্বোধ" এর কাছে সেই আইনের ব্যাখ্যা দেয়া নাই, অর্থাৎ, সে খোলা অবস্থায় রয়েছে। যে কারণে "অন্তর্বোধ" এর কাছে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের ঘটমান বিষয় গুলোকে রহস্যময় মনে হয় কিন্তু যেই মুহূর্তে "বোধ" এর যুক্তির বাইরে যেয়ে "সাবকন্সাস মাইন্ড" কিছু ভাববার চেষ্টা করে তখনই "বোধ" এসে বলে, তুমি ভুল করছো, আইন এভাবে তৈরী করা আছে, তোমাকে এভাবেই সব কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। "বোধ" এবং "অন্তর্বোধ" এর এই দ্বন্দ্বের খেলাকে এই যন্ত্রের মাঝে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ধরে নেই যে, আমরা এখন কোয়ান্টাম লেভেলে আছি কিন্তু "বোধ" এবং "অন্তর্বোধ" এর সেই দ্বন্দ্ব এখনো আমাদের মাঝে বিদ্যমান এবং "বোধ" এই কোয়ান্টাম লেভেলেও "অন্তর্বোধ" এর ওপর মাতব্বরি করতে চাইছে। যে কারণে আপনি মনে করছেন, হাত-পায়ের অস্তিত্বের সাথে আপনার অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আরও কিছুক্ষণ এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে, তারপর একসময় "অন্তর্বোধ" জয়ীর আসনে থাকবে। এরপর আপনিই অনুভব করবেন আপনি কে।

আমি এখন মজা পেয়ে গিয়েছি। আমার তো দায়ীত্ব শুধু ভাবনার, সেই ভাবনা থেকেই ভাবলাম,
-আমি কে?
সাথে সাথেই একটা গুরু-গম্ভীর কন্ঠের উত্তর ভেসে এলো,
-আপনি একক সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট একক শক্তির এক বিশাল আঁধার।

তারপরই প্রভাতদার উৎকন্ঠায় ভরা প্রলাপ ভেসে এলো আমার কাছে,
-আপনি এখনই আপনার "অন্তর্বোধ" কে "বোধ" এর ওপর জয়ী হ'তে দেবেন না। আমাদের যেতে হবে বহুদূর, এই চলার মাঝেই চতুর্মাত্রিক পৃথিবীকে বিশ্লেষন করতে চাইলে চতুর্মাত্রিক পৃথিবীর দায়ীত্বপ্রাপ্ত "বোধ"কে আমাদের প্রয়োজন। "অন্তর্বোধ" কে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করুন শুধু বর্তমান মুহূর্তটুকু বুঝবার জন্য কিন্তু চুড়ান্ত শক্তি হিসেবে তাকে যদি এখনই স্বীকার করে নেন তবে হয়তো আপনি জীবিত

ফিরতে পারবেন না। বর্তমান অবস্থার জন্য কারো দোষ খোঁজার চেষ্টা না করে আপনার "আমি"কে সতর্ক অবস্থায় রাখুন। আমার কথার ওপর বিশ্বাস রেখে আপনার "আমি"কে আমার "আমি" এর ওপর নির্ভরশীল করে একটা সমষ্টিগত অবস্থান তৈরী করার চেষ্টায় থাকুন।

আমি কিছু ভাববার আগেই দেখি প্রভাতদা তখনো ব'কেই চলেছেন,
-আপনাকে একটা মজার গল্প বলি, আমি যখন তৃতীয়বার এই ভ্রমন শেষে চতুর্মাত্রিক পৃথিবীতে ফিরে গেলাম তখন চোখ বন্ধ রেখেই আমি শুধু মনে করলাম, আমি ইচ্ছে করলেই এখন এই যন্ত্রের বন্ধ দরোজা দিয়ে বের হয়ে যেতে পারবো। ইচ্ছেটা কেবল ভেবেছি, সাথে সাথে দেখি আমার দেহটা উঠে যন্ত্রের বাইরে চলে গেল। বাইরে যেয়ে দেখি আমি বাইরে কিন্তু আমার দেহটা পরে আছে ভেতরেই। আমার সাথীরা যন্ত্রের দরোজা খুলে দেখে আমার পালস নেই, নিথর একটি দেহ পরে আছে। তাড়াতাড়ি তারা যা কিছু করা সম্ভব সব কিছুই করা শুরু করলো। আমার চতুর্মাত্রিক দেহের বুকের ওপর যখন বুকের পাঁজর ভাঙ্গা দ্রিমদ্রিম আঘাত করা শুরু করলো তারা, তখন প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করার পর আমার মনে হল, এই চতুর্মাত্রিক বিশ্বের আইন সম্পর্কে সব কিছু না জেনে সেই আইন ভাঙ্গবার চেষ্টা করার পরিনতি শুভ নয়। তাড়াতাড়ি আবার চতুর্মাত্রিক দেহে ফিরে গেলাম। আজকের ভ্রমন শেষে যদি আমরা ফিরে যেতে পারি তবে আপনিও চেষ্টা করতে পারেন।

এই গল্প নাকি আবার মজার গল্প। এবার আমি প্রায় ধমকের স্বরেই বলে উঠলাম,
-আপনাকে বারেবারে বলছি “যদি ফিরে যেতে পারি” ধরনের শব্দগুলো উচ্চারণ করবেন না, তারপরও আপনি করেই চলেছেন। যাক, আমরা যে ফিরতে চলেছি সেটা আমরা কিভাবে আগে থেকে বুঝতে পারবো?

প্রভাতদা বললেন,
-খুব সহজ, আপনার মাঝে এখন যে ওজন শুন্য অনুভূতি কাজ করছে সেটা কেটে যেতে থাকবে এবং নিজের কাছে নিজেই একটা চাপ অনুভব করবেন। তার আগে আমাকে বলুন তো, আপনি ফিরে যেতে চাইছেন কেন? কি এমন কাজ রয়েছে ঐ চতুর্মাত্রিক পৃথিবীতে যেটার জন্য আপনাকে ফিরে যেতেই হবে। আমি প্রথমবার যখন এসেছিলাম, তখন তো না ফেরার সম্ভবনাকে মাথায় রেখেই এসেছিলাম। এখন আমি ফিরতে চাই শুধু মাত্র বিজ্ঞানের স্বার্থে। আমি আপনার চতুর্মাত্রিক বিশ্বে ফিরে না যাবার সম্ভবনাকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি দু'টো কারণে,
১) আমাদের ফিরে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করছে সূক্ষাতি সূক্ষ একটি ধারনার উপর।
২) চতুর্মাত্রিক বিশ্বের সম্রাট “বোধ” কে যাতে আপনি হারিয়ে না ফেলেন। “অন্তর্বোধ” যদি চুড়ান্ত ভাবে জয়ী হয় তবে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত।

আমি রেগে যেয়ে বকা দিয়ে বললাম,
-বারেবারে বলছি এই অনিশ্চয়তার কথা বলবেন না।।
প্রভাতদা বললেন,
-নাহ, আপনার মাঝে এখনো রাগ-ক্ষোভ, দুঃখ-সুখ, ভাল-মন্দ ইত্যাদি চতুর্মাত্রিক দ্বান্দ্বিক "বোধ" গুলো পুরো মাত্রায় কাজ করছে। "অন্তর্বোধ" এর সেই প্রশান্তিময় ভাললাগা-ভালবাসা থেকে বহু দূরে আছেন আপনি। এখন অন্য কোন আলাপ না করে প্রথম যে কাজটায় আমরা হাত দিয়েছিলাম সেটাই বরং করি।

কেমন যেন সবকিছুতে আমার মাঝে এক নিস্পৃহ নিঃসঙ্গতা কাজ করছে বলে মনে হল, বললাম,
-কোন কাজে হাত দিয়েছিলেন সেটাই আমার মনে নেই। বলুন, আমার তো আপনাকে থামাবার কিছু নেই, আপনি বললেই আমি শুনতে বাধ্য।

ভেসে এলো প্রভাতদার কন্ঠ,
-সার্ন যখন পুরোপুরি কাজ করে তখন পাওয়ার কঞ্জামপশন কত বিশাল আপনি ভাবতেও পারবেন না, প্রায় ১.৫ টেরাওয়াট প্রতি ঘন্টায়। আর আমাদের এই এক্সপেরিমেন্ট একাই ব্যবহার করে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৩ টেরাওয়াট। যে কারণে আমরা ছুটির দিন রবিবারে কাজ করি এবং এই এক্সপেরিমেন্টের সময় সার্ন অন্ধকার থাকে, এমনকি আমাদের এই ল্যাবরেটরি ছাড়া কোথায়ও এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমও কাজ করে না। আপনি ল্যাবরেটরির কাঁচের ঘরের মাঝে ছোট যে বৃত্তাকার ঘরটি দেখেছিলেন, সেটা কিন্ত খুব ছোট কিছু নয়, তিন ফুটেরও কম ব্যাসের একটি গোলাকার বৃত্ত। মূল হেড্রন কোলায়ডারের চেয়েও সফিস্টেকেটেড ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্র সংযুক্ত করা আছে। কিন্ত সমস্যা দাঁড়ালো, আমাদের কোন যন্ত্রই এখানের সম্পুর্ন ঘটনাবলীকে ধারন করতে পারে না। সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য সম্পুর্ন ভাবে আমরা তথ্য শুন্য অবস্থায় থাকি।

আমি বললাম,
-ঐ আধা সেকেন্ড বা এক সেকেন্ডের তথ্য না থাকলে পুরো এক্সপেরিমেন্টই কেন ব্যার্থ বলে ধরে নিচ্ছেন।

দাদা বললেন,
-চোখ, কান, নাক, মুখ, স্পর্শ ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রীয় থেকে যে তথ্য গুলো মানুষ পায়, সেই তথ্য গুলো একত্রিত করে চতুর্মাত্রিক "বোধ" একটি পারসেপশন তৈরী করে। এটাকে চতুর্মাত্রিক কল্পলোক বলতে পারেন। এই কল্পলোক একান্তই মানুষের নিজস্ব। যদিও সব মানুষের মাঝেই একই ধরনের চতুর্মাত্রিক "বোধ" কাজ করার কারণে প্রায় সকল মানুষই একই পারসেপশনে চলছে। আপনি যদি আপনার "বোধ" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই পারসেপশন বা কল্পজগত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, তাহলে চতুর্মাত্রিক পৃথিবীতে আপনার সামনের দেয়ালটি আপনার জন্য কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা, আপনি আপনার মত করে আপনার পারসেপশন তৈরী করে নিতে পারবেন। এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্যও যদি আপনার পঞ্চন্দ্রীয় আপনার ব্রেইনকে তথ্য না পাঠায় তবে যেমন চতুর্মাত্রিক বিশ্বে আপনার সব কিছুই আউলা ঝাউলা হ'য়ে যাবে, ঠিক একই ভাবে আমাদের এক্সপেরিমেন্টের ঐ সেকেন্ডের ভগ্নাংশের তথ্যহীনতা আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাবে।

আমি হেসে দিয়ে বললাম,
-আপনাদের পথই আপনাদের জানা নেই সেখানে ভুল পথ না শুদ্ধ পথ সেটা নিয়ে আপনারা ব্যস্ত।

প্রভাতদা আমার খোঁচাটাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন,
-ঠিক আছে আপনার কথা। তবে আমরা প্রাথমিক ভাবে একটা পথ তো নির্ধারন করেছিলাম। সেই পথটা হল, হেড্রন কোলায়ডারে যখন দু'টো হাইড্রোজেন প্রোটন কণিকাকে প্রায় আলোর গতিতে সংঘর্স করিয়ে এটমের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ 'কোয়ার্ক", "গ্লুয়ন" কণিকা বের করা হচ্ছে তখন একই সাথে ক্ষণিকের জন্য হলেও হিগস কণিকা এবং একই সাথে একটা ফিল্ড তৈরী হচ্ছে, হিগস ফিল্ড। সেই ফিল্ড এতোই শক্তিশালী যে সেটাকে এটম বোমের সাথেও তুলনা করা চলেনা। আমাদের ভাবনা, আমরা যদি

একই ধরনের কন্ট্রোল্ড কলিশন দিয়ে একটা ফিল্ড তৈরী করতে পারি তাহলে কি হ'তে পারে? সেই কি হতে পারে থেকেই এই এক্সপেরিমেন্টের ধারনা। বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন প্রাথমিক ভাবে প্রমান করে যে, কোয়ান্টাম লেভেলে আলোর চেয়েও গতি সম্পন্ন থিয়োরেটিক্যাল কনিকা "ট্যাকিয়ন" সৃষ্টি হ'য়ে এখানে কোয়ান্টাম জগত তৈরী ক'রে একটি ব্ল্যাকহোলের মত চুড়ান্ত ভরক্ষেত্র তৈরী করে।

আমি বেশ অবাক কন্ঠেই প্রশ্ন করলাম,
-সে কি কথা, আমি এখন চুড়ান্ত হালকা অবস্থায় আছি আর আপনি বলছে ব্ল্যাকহোলের মত এক চুড়ান্ত ওজন আমাকে গ্রাস করেছে।

এবার কেন যেন প্রভাতদার কন্ঠে কিছুটা হতাশার সূর ধ্বনিত হল,
-এতো বিশাল ম্যাথমেটিকাল প্রবাবিলিটি আপনাকে কিভাবে বোঝাবো বুঝতে পারছিনা। এক দিক থেকে শুরু করলে আরেক দিকে আটকে যাই। প্রথম কথা, ভর, ওজন এসব বৈশ্বিক কথাবার্তা। এখানে বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন,
১) আপনি যদি ব্ল্যাকহোলের কিনারে বা মাঝে থাকেন তবে ব্ল্যাকহোলের ভরের তুলনায় তো আপনি হালকাই।
২) ব্ল্যাকহোলের জন্য এই বৃত্তটিকেই বিশাল ভর সম্পন্ন হ'তে হবে এমন কোন কথা নেই
৩) এবং আমাদের ব্ল্যাকহোলের মাঝেই যেতে হবে তেমন কোনো কথাও নেই। আমাদের চারপাশে যে ফিল্ড বা ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে সেটা এতোই শক্তিশালী যে, আমরা ঠিক ব্ল্যাকহোলের কিনারে আছি ধরে নিলে ইকুয়েশন কিছুটা হলেও মিলে যায়। সেই ইকুয়েশনের ভিত্তিতে ব্ল্যাকহোলের কথা বলছি। আমরা কোথায় আছি, কেন আছি সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো, তার আগে প্রয়োজন যন্ত্রের মেকানিজমটা সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারনা নেয়া। আমার ভাবনাকে থামিয়ে দেবার মত কিছু আপনি ভাবাবেন না, তাহলে হয়তো কিছুটা উপলব্ধি করার মত ধারনা আপনার মাঝে তৈরী করতে পারবো।

আমি বললাম,
-আপনি বললেন আমার "বোধ" আর আপনার "বোধ" এক সূতোয় গাঁথা। তাহলে আপনাকে এতো কথা বলতে হচ্ছে কেন? ঢেলে দিন আমার মাথায়। তাছাড়া আপনার যন্ত্রের মেকানিজম সম্পর্কে আমার জেনে কি লাভ।

প্রভাতদা বললেন,
-আমি চাইলেই তো আপনার মাঝে ঢেলে দিতে পারবোনা, আপনাকে চাইতে হবে। আপনি এখনো কোয়ান্টাম লেভেলের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলাতে পারেননি, যে কারণে আপনার চাহিদা আমার বক্তব্যের প্রতি, সেটাই চলছে। আপনি যখন যন্ত্রটির ম্যাকানিজম সম্পর্কে জানতে চাইছেন না তাহলে আর আমার ভাবনা ওদিকে যাবে না। যন্ত্রটির সাইন্টিফিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে, একটি কথা বলেই শেষ করি। মধ্যাকর্ষন শক্তি সম্পর্কে আপনার জানা আছে নিশ্চয়ই। নিউটন সাহেব যেভাবে মধ্যাকর্ষন শক্তিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বর্তমানের বিজ্ঞান সেই ব্যাখ্যা কিছুটা হলেও অস্বীকার করে। মধ্যাকর্ষন এখন ব্যাখ্যাতীত একটা ভুতুরে শক্তি বা বস্তুও হতে পারে। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষন কাটিয়ে মহাশুন্য ভ্রমনে যেতে সেকেন্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার গতির প্রয়োজন। আপনি প্রায় তিন ফুট ব্যাসের যে বৃত্তের মত যন্ত্রটিতে আছেন, সেটার চারদিকে বহু রকম স্তরের বহু বৃত্ত রয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তটি স্পিন করছে সেকেন্ডে ১১ কিলোমিটারের ওপরে, সেটাকে কাউন্টার করার জন্য আরেকটি বৃত্ত রয়েছে। যে কারণে আপনি বৃত্তের ঘুর্ননটা বুঝতে পারেননি, ব্যালেন্সড অবস্থা তৈরী হয়েছিল। তারও ওপরে রয়েছে আরো দু'টি বৃত্ত, যেটি

একে অপরকে ব্যালেন্সড করে ঘুড়ে চলেছে প্রতি সেকেন্ডে ৭৩ কিলোমিটার স্পীডে। তারও পরে রয়েছে মৌলিক মিনি হেড্রন কোলায়ডার চেম্বার, যেখানে প্রোটন কণিকাকে আলোর গতিতে আনার পর একটা সংঘর্ষ তৈরী করানো হচ্ছে।

আমি বললাম,
-একেবারে ৭৩ কিলোমিটার কেন?
উনি বললেন,
-ধরা হ'য়ে থাকে প্রতি সেকেন্ডে ৬৩ থেকে ৭৩ কিলোমিটার গতিতে মহাবিশ্ব আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।
আমি বললাম,
-সেকি কথা। আমি তো জানতাম গ্যালাক্সি গুলো একে অপরের কাছ থেকে আলোর গতির চেয়েও বেশী গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে।

উনি বললেন,
-বাহ, আপনি তো দেখছি এস্ট্রনমি সম্পর্কে জানেন। জানেন না ধরে নিয়ে কথাটি বলেছিলাম। তবে গ্যালেক্সি গুলো ছুটছে না বরং ধারনা করা হচ্ছে মহাশুন্য আলোর গতির চেয়েও বেশী গতিতে বেড়ে চলেছে। যে কারণে, হাবল কন্সট্যান্ট হিসেবে মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত ৭৩ কিমি/সেকেন্ড বেছে নেয়া হয়েছে। এগুলো আপনার জানার প্রয়োজন নেই, এরকম আরও অনেক জটিল অংকের সহযোগীতায় এবং তারচেয়েও জটিল প্রক্রিয়ায় যন্ত্রটি তৈরী ক'রে এই ব্যাসের সমান একটি ফিল্ড তৈরী করা হয়েছে, যে ফিল্ডটির স্থায়ীত্ব খুবই কম, ধরে নিন এক সেকেন্ডের প্রায় একশত ভাগের এক ভাগের সমান। সেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির ওঠা নামার মাঝের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে কি ঘটে চলেছে এই বৃত্তের মাঝে, সেটা নিয়েই আমরা কাজ করে চলেছি।

**<u>আমার এন্ট্যাঙ্গেল্ড জ্ঞানের গপ্পো</u>**

এতোক্ষণে বোধহয় আমি দাদার এন্ট্যাঙ্গেল্ড অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছি। বিভিন্ন ম্যাথেমিটিকাল ইকুয়েশন আমার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে বললাম,
-দাদা, এসব ইকুয়েশনের জটিলতা আমার জানবার প্রয়োজন নেই। থামান ওগুলো।

দাদা বললেন,
-আমার থামাবার ক্যাপাসিটি নেই, আপনি জানতে চাইবার পদ্ধতিটা বুঝতে শিখছেন। এখন আপনি ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম লেভেল উপলব্ধি করতে পারবেন। রাগ-ক্ষোভ-ক্ষুধা থেকে শুরু করে সকল কিছুর উর্ধ্বে যেয়ে এক প্রশান্তির যায়গায় পৌঁছে যাবেন আপনি। সেটা এমনই এক সুন্দর যায়গা যেখান থেকে আপনার ফিরবার ইচ্ছে লোপ পেয়ে বসতে পারে। তবে আমার অনুরোধ, ঐ যায়গায় অন্তত এবারের ভ্রমনে যাবেন না। আপনার যদি খুব ভাল লাগে তবে আগামী রবিবারে সবাইকে জানিয়ে আবার এই এক্সপেরিমেন্টে আসবেন, তারপর যা হয় হবে মেনে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো, যেখানে যেয়ে পৌঁছাই, চলে যাবো।

আমি কথাটিকে বেশী গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম না। বললাম,

-আপনারা তো ধারনা করছেন এখানে পাঁচটা জিনিষের যে কোন একটা তৈরী হয়েছে। কিন্ত এভাবে ভেবেছেন কি যে, একই সাথে দু'তিনটি বিষয়ও ঘটে চলতে পারে।
দাদা বললেন,
-আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। আপনার ভাবনা গুলোকে আরও পরিষ্কার করুন।
আমি বললাম,
-মানে আর কিছুই না, একই সাথে আপনারা কোয়ান্টাম ফিল্ড, ব্ল্যাকহোল এবং আরও কিছু জিনিষ তৈরী করেছেন হয়তো। আপনারা আরেকটি বিষয়ের সম্ভবনার কথাও ভাবছেন না। সেটা কি আপনাদের ম্যাথেমেটিক্স সাপোর্ট করছে না?
দাদা বললেন,
-কোন বিষয় বলুন তো।

এত্তো বড় বড় সাইন্টিস্টদের ভুল ধরবার সাহস পেলাম কোথায় বুঝবার চেষ্টা করতে যেয়ে মনে হল প্রভাতদার সাথে আমার এন্ট্যাঙ্গেলমেন্টের কথা, হয়তো ওটাই আমাকে জ্ঞ্যানী করে তুলেছে। তারপরও সরাসরি উত্তর না দিয়ে ঘুড়িয়ে বললাম,
-আপনি কি "স্টারট্রেক" সিরিজ গুলো দেখেছেন?
দাদা বললেন,
-কিছু সিরিজ তো দেখেইছি ছোটবেলায়।
আমি বললাম,
-আপনি যদি কোয়ান্টাম জগতই তৈরী করেছেন বলে ধরে নিয়েই থাকেন, তাহলে "ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশন" মেশিন তৈরী করার কথাটা মাথা থেকে ফেলে দিচ্ছেন কেন?

প্রভাতদা মনে হ'ল হারিয়ে গিয়েছেন, কোন ভাবনার পালস পাচ্ছিনা। কিছুক্ষণ পর আমিই ভয় পেয়ে গেলাম,
-দাদা, আছেন তো আমার সাথে।

এবার উত্তর পেলাম,
-আপনাকে ছেড়ে যাবো কোথায় এই যায়গা থেকে। আমি আসলে কিছুটা হতভম্ব হয়ে পরেছিলাম। এই সামান্য বিষয়টি আমরা এড়িয়ে গেলাম কি করে। পরে মনে হল আমরা ব্ল্যাকহোল নিয়ে এতো বেশী ভেবেছি যে, এটার সম্ভবনার কথা আমাদের মাথায়ই আসেনি। যাক, আপনাকে এক্সপেরিমেন্টে আনতে পেরে আর কিছু না হোক, একটা নতুন দিক তো পেলাম।

আমি বললাম,
-আপনি আসলে আমাকে বোঝাতে যেয়ে দেবার পাল্লাটা ভারী করে ফেলেছেন। আমি শুনছি বলে আমি আস্তে আস্তে আপনার তথাকথিত কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ড হজম করা শুরু করে দিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে এখনই চতুর্মাত্রিক পৃথিবীতে ফিরে যেয়ে আপনার সাথে ইকুয়েশন গুলো সলভ করতে বসে যাই।
দাদা বললেন,
-তাড়া দিয়ে নিজেকে এই ক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। আগে এখান থেকে ফিরবার কথা ভাবনায় রাখার চেষ্টা করুন। নতুন আলোর ঝলকানিতে আপনি আসলে বেশী এক্সাইটেড। ধীরে চলুন। বলুন কি ভাবছেন আপনি।

আমার মতামতে দাদার আগ্রহের গভীরতা অনুভব ক'রে নিজেকে বেশ বিজ্ঞ মনে হল, বললাম,
-ঠিক আছে, আগে আমরা সাজিয়ে ফেলার চেষ্টা করি আপনারা এই যন্ত্র দিয়ে কি কি তৈরী করার সম্ভবনা সৃষ্টি করেছেন বলে ধারনা করছেন।
১) ব্ল্যাকহোল
২) টাইম মেশিন
৩) কোয়ান্টাম জগত
৪) মৃত অবস্থা।
আর আমার ভাবনা
৫) ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশন
এবার আমরা একটা একটা করে বাতিল করার চেষ্টা করি।

উনি বললেন,
-বাতিল করবার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখবেন,
১) আমরা গত প্রায় দুই বছর যাবৎ এই এক্সপেরিমেন্ট করে যাচ্ছি এবং আজকেরটা সহ এটা ১৬৩তম এক্সপেরিমেন্ট।
২) প্রথম দিকে আমরা যে বস্তু গুলো পাঠাতাম সেগুলো আর ফিরে আসতো না।
৩) বস্তুগুলোর ফিরে আসা যখন নিশ্চিত করতে পারলাম আমরা, তারপর প্রানী পাঠানো শুরু করলাম।
৪) প্রতিটি প্রানী ফিরে এলেও একটি প্রানীও জীবিত ফিরে আসেনি।
৫) মানুষ হিসেবে যখন আমি প্রথম গিয়েছি তখনই প্রথম প্রানী হিসেবে জীবিত ফিরে এসেছি এবং সেই ফিরে আসবার পরেও মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রানীদের আমরা পাঠিয়েছি অক্সিজেন মাস্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সহ কিন্তু এখন পর্যন্ত মানুষ ছাড়া একটা প্রানীও জীবিত ফেরেনি। এটাকে আবার নিষ্ঠুরতার তালিকায় নেবেন না আশা করি, জ্ঞানের স্বার্থে আমি নিজেও জীবন মৃত্যুর একই অজানা মিশনের রিস্ক নিয়েছি।।

প্রভাতদার কোন কথাকেই আমার কেন যেন আর পাত্তা দিতে ইচ্ছে করছেনা, কেমন যেন মনে হচ্ছে যে, উনি যা বলবেন সেটা আমার জানা আছে। আমি আপন মনে ভেবে চলেছি। এই চেম্বারে কি ঘটছে সেটা নিয়ে ওনারা যা ভাবছেন তার একটাও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। বস্তু গুলোকে যখন পাঠিয়েছেন তখন আর্থ ফ্রিকুয়েন্সিতে সেট করার আগে পর্যন্ত হারিয়ে যেত কেন বা হারিয়ে যাবার পর সেগুলো কোথায় গিয়েছে? বিশেষ করে প্রান নিয়ে উনি ফেরৎ আসায়, একমাত্র ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশন ছাড়া বাকি চারটি পয়েন্টের হিসেবই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম,

-আসুন তো, আমরা একটা করে সম্ভবনা ডিস্কার্ড করার চেষ্টা করি। যদি টাইম ট্রাভেলকে মেনে নেই তবে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই লক্ষ বছর অতিক্রম করে ভবিষ্যতে যেয়ে হাজির হয়ে আবার ফিরে আসছেন চতুর্মাত্রিক পৃথিবীর এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভবিষ্যতে। সময় তো শুধুই একটি সরল রেখায় ভবিষ্যত মূখী, অতীতে ফিরতে পারে না। যে কারণে আমরা কখনোই ভবিষ্যত টাইম ট্রাভেলারদের বর্তমান চতুর্মাত্রিক বিশ্বে দেখতে পাবো না। সুতরাং, মাত্র ভগ্নাংশ সেকেন্ডের ভবিষ্যতে আমরা আবার যে ফিরে আসছি সেটা চতুর্মাত্রিক পৃথিবীর সময়েই ফিরে আসছি, ভবিষ্যতের কোন পৃথিবীতে নয়।

আমার হঠাৎ খুব হাসি পেলো। প্রভাতদা বললেন,

-হাসছেন কেন?
আমি বললাম,
-হঠাৎ মনে হল, আমরা যদি সত্যিই টাইম ট্রাভেলার হয়ে থাকি, এবং টাইম ট্রাভেল করে এক ঘন্টাও ভবিষ্যতে চলে যাই, সময়ের একমূখী ভবিষ্যত গতির কারণে আমরা তো আর কখনোই ঐ একঘন্টা অতীতে ফিরে যেতে পারবো না, সেক্ষেত্রে তো এখান থেকে বের হবার পর আমাদের দেখা হবে একঘন্টা পরের আতিকের সাথে, কিছুতেই আমরা এক ঘন্টা আগের আতিকের দেখা পাবো না।

প্রভাতদা মনে হল কিছুটা বিরক্ত, বললেন,
-আপনি আসলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে টাইম ডাইলেশন থিয়োরি মিলিয়ে ফেলছেন অথবা ইচ্ছে করেই পুরোপুরি বুঝতে চাইছেন না। টাইম ডাইলেশন থিয়োরি অনুযায়ী আপনি পৃথিবীর ভবিষ্যতে ফিরে আসতেই পারেন কিন্তু আপনার জন্য সেটাই বর্তমান। অন্যদিকে যদি আমরা কোয়ান্টাম ফিল্ডের মাঝ দিয়ে টাইম ট্রাভেল করেই থাকি তবে বস্তুর সুপার পজিশনের কারণে আপনি দুই সময়েই থাকতে পারেন, যদিও দুইটি "আপনার" কখনোই দেখা হবে না। এই প্রবাবিলিটির কারণেই আরেকটি ভাবনা হয়তো আপনার চলে আসতে পারে, তাহলে কি আমাদের "বর্তমান" নির্ধারিত হয় ভবিষ্যতের কর্ম দ্বারা। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সুপার পজিশন বুঝেছেন তো?

আমি বললাম,
-হ্যা হ্যা, ওটা অনেক আগেই আপনি আমার মাথায় ঢেলে দিয়েছেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে একই সময়ে একই বস্তুর দুই যায়গায় থাকার সম্ভবনাকে "সুপার পজিশন" নাম দিয়েছেন আপনারা। আমি এখন আছি এক জটিল ধাঁধার মাঝে। যদি টাইম ট্রাভেল করছি বলে ধরে নেই তাহলে আমাকে বলুন তো, প্রথম দিকে যে বস্তুগুলো পাঠালেন, সেগুলো কোথায় যেতে পারে।

প্রভাতদা বললেন,
-মোটেও জটিল কিছু নয়। আপনি সমাধানের রাস্তাটা ঠিক করতে পারছেন না। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষন শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে ১১ কিলোমিটার স্পীড প্রয়োজন, ঠিক একই ভাবে এই বিশ্বের "সময়"কে অতিক্রম ক'রে নিয়ন্ত্রিত টাইম ট্রাভেল করার জন্য একটা কিছু হয়তো প্রয়োজন, যেটা না জানার কারণে আর্থ ফ্রিকুয়েন্সিতে আসবার পরপরই আবার এই বিশ্বের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে একই ভবিষ্যতে ফিরে যাচ্ছি আমরা। প্রথমদিকে যন্ত্রটির মাধ্যমে পাঠানো বস্তু গুলো ভবিষ্যতের পাতায় হারিয়ে গিয়েছে। একই কথা গ্রহনযোগ্য যদি এখানে আমরা ব্ল্যাকহোল তৈরী করে থাকি, মহাজগতের বা সময়ের কোথায়ও ওগুলো হারিয়ে গিয়েছে।।

-তাহলে তো এর উত্তর জানার একটাই উপায়, যন্ত্রটিতে আর্থ ফ্রিকুয়েন্সি সেট না করা।
উনি বললেন,
-তাহলে তো আর ফিরে আসতে পারবো না, সেক্ষেত্রে যে তথ্যই পাই না কেন অথবা যেটাই আবিষ্কার করিনা কেন, বর্তমান কে এবং এই বিশ্বকে তো জানাতে পারলাম না।
আমি বললাম,
-আপনিই বলছেন ইগোকে বাদ দিতে অথচ নিজেই এখনো "আমিত্ব" থেকে বের হ'তে পারেননি। আগে সিদ্ধান্ত নিন, আপনার জানা প্রয়োজন নাকি বর্তমান সময়কে অথবা এই বিশ্বকে জানানো প্রয়োজন।

বেশ কিছুক্ষণ প্রভাতদার কোন ভাবনার পালস পেলাম না, মনে হল দীর্ঘ সময় পর উনি বললেন,

-হুম, পরের ভ্রমনের আগে ভেবে দেখা যাবে। তাহলে প্রথম দুই পয়েন্টের বিষয়ে আপনি আমাদের সাথে একমত যে, সম্ভবনা আছে।

আমি বললাম,
-আপনাদের সব জটিল ইকুয়েশনও তো প্রমান করে সম্ভবনা থাকার কথা, তবে কোয়ান্টাম জগত কে আপনি বোধহয় বাদ দেবার চিন্তা করতে পারেন। কারণ, কোয়ান্টাম জগতে যেতে হলে তো আপনার নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় ভাগ করতে হবে, যদি যন্ত্রটি সেই ভাগ করেই থাকে তাহলে আবার কণা গুলোকে একসাথে করছে কি ভাবে সেটা আমার কাছে বোধগম্য নয়।
প্রভাতদা বললেন,
-খুব সহজ বিষয়। আমরা একটা কোয়ান্টাম ফিল্ড তৈরী করেছি যেখানে কোয়ান্টাম জগতের আইন কানুন মানা হচ্ছে।

আমি বললাম,
-নাহ, মানতে পারলাম না। যদি তাইই হয়, তাহলে আমার হাত-পা-মুখ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না কেন? তাছাড়া প্রতিটি প্রানের এনার্জি ফিল্ড কত সেটা তো আর আপনাকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই, একটি মানুষকে যদি কোয়ান্টাম ফিল্ডে নিতে চান তবে তাকে আগে বিলিয়ন ডিগ্রী ঠান্ডা করে নিতে হবে। ধরেই নিচ্ছি কোয়ান্টাম জগতে এই ফিল্ডে ঢোকার আগের মুহূর্তে আমাদের ঠান্ডা করা হয়েছে কিন্তু ঐ তাপমাত্রায় আমরা অবশ্যই মারা গিয়েছি, তাহলে আবার জীবিত ফিরে আসছি কি ভাবে।

উনি বললেন,
-তাপমাত্রা মানে কি? ঐ তো আবার আপনি চতুর্মাত্রিক "বোধ"এর কাছে চলে যাচ্ছেন। আপনাকে তো প্রথমেই "ম্যাট্রিক্স" মুভিটির কথা বললাম। আপনি এখনো চতুর্মাত্রিক জগতের জন্য তৈরী করা আপনার "বোধ"এর কাছে আছেন, "অন্তর্বোধ"এর কাছে যেতে পারছেন না, যেতে পারলেই বুঝবেন, বিশ্ব আপনার জন্য তৈরী করা হয়নি বরং আপনিই বিশ্ব তৈরী করে চলেছেন।

আমি বললাম,
-একি ঝামেলায় ফেললেন আপনি। তাহলে তো ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশন এবং মৃত্যু বাকি রইলো। মৃত্যুর সম্ভবনাকে আমরা এক ধাক্কায় ফেলে দিতে পারি বোধহয়। যদিও অন্যান্য প্রানীগুলো মৃত অবস্থায় ফিরে এসেছে কিন্তু মানুষ তো জীবিতাবস্থায় ফিরে গিয়েছে, মারাই যদি যাবেন তাহলে আবার জীবন ফিরে পাবেন কি করে।

প্রভাতদা বললেন,
-আপনি মৃত্যুকে ফেলে দিতে পারেন না। চতুর্মাত্রিক জগতের মৃত্যুর ডেফিনেশন কি?
আমি বললাম,
-মৃত্যুর ডেফিনেশন নিয়ে কখনো ভাবিনি।

উনি বললেন,
-যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিষ্ক্রিয়তার কারণে ধরে নেয়া হয় আপনি মৃত সেটা আসলে কিছুই না, আপনার চতুর্মাত্রিক "বোধ" আপনার "অন্তর্বোধ"কে বোঝাতে শুরু করে, দেখো তুমি নড়াচড়া করতে পারছোনা, তোমার দেহের হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি যাবতীয় জীবন সংক্রান্ত কাজ গুলো বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে,

তুমি মারা গিয়েছো। "অন্তর্বোধ" তখন স্থান-কাল-পাত্র সংক্রান্ত বিশ্বাস কে ত্যাগ করে। সাথে সাথেই চতুর্মাত্রিক যুক্তিতে বিশ্বাসী "বোধ" তাকে পরিত্যাগ করলেও তখনও "অন্তর্বোধ" কাজ করে চলেছে, হোক সেটা সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য। কিন্তু ঐ সময়টুকুর মাঝেই সে অনন্ত সময়ে উপনীত হয়। চতুর্মাত্রিক আইন দিয়ে পরিচালিত "বোধ"এর অনুপস্থিতিতে এথিক্স এবং মোরাল দ্বারা পরিচালিত "অন্তর্বোধ" সময়ের উর্ধ্বে যেয়ে অনুভব করে তার প্রশান্তি অথবা যন্ত্রনা। সময় কিন্তু এখানে অনন্ত-অসীম, যেমন আমরা এখন অসীম সময় পার করছি। প্রতিটি ধর্মেরই অবিকৃত অংশে যদি পৌঁছাতে পারেন তবে দেখবেন, "অন্তর্বোধ"কে ঐ প্রশান্তির স্তরে রাখবার জন্যই নির্দেশনা দেয়া আছে। আপনি কি এমন কোন অভিজ্ঞতার গল্প পড়েছেন যে, এক ব্যক্তিকে ফিজিক্যালি মৃত বলে ঘোষনা করার পর সে আবার ফিরে এসেছে এবং তার অভিজ্ঞতা বর্ননা করেছে।

আমি বললাম,
-হ্যা পড়েছি।
উনি বললেন,
-তাদের সকলের অভিজ্ঞতার বর্ননা কিন্তু প্রায় একই রকম। আলোর ঝলকানি, প্রশান্তি ইত্যাদি। এই যন্ত্র কাজ করা শুরু করার পর আপনিও একই অনুভূতির মাঝ দিয়েই গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন।

আমার কেন যেন এসব ভ্যাটর ভ্যাটর ভাল লাগছে না, চুপচাপ কিছুক্ষণ সময় কাটাবার খুব ইচ্ছে থাকলেও একটা প্রশ্ন মনে জাগলো,
-তাই যদি হবে তাহলে আপনাদের এই এক্সপেরিমেন্টে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রানী কেন মারা যাচ্ছে?

উনি বললেন,
-অন্যান্য প্রানীর "অন্তর্বোধ" মানুষের "অন্তর্বোধ" এর তুলনায় খুবই কম শক্তিশালী। আপনাকে তো আগেই বলেছি, জড় পদার্থই বলুন আর প্রানীই বলুন, সব কিছুই কোয়ান্টাম জগতে যেয়ে একই আচরন করে। সেজন্যই মনে করা হয়, বিশ্ব, মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে সকল কিছুরই "বোধ" আছে।

আমি বললাম,
-এটা কোন তত্ব নয়, আপনার যুক্তি নির্ভর অনুমান মাত্র। কারণ, এটাই যদি হবে তাহলে বৃক্ষেরও সামান্য হ'লেও "অন্তর্বোধ" আছে। কিন্তু একটা বৃক্ষের মৃত্যুর পরও তার চতুর্মাত্রিক অবস্থান থাকছে কাঠ হিসেবে কিন্তু অন্যান্য প্রানীর দেহ পচনশীল কেন।
প্রভাতদা বললেন,
-অবশ্যই আমার কথাগুলো একটা প্রপোজিশন মাত্র কিন্তু আপনি একটা যায়গায় একটু ভুল করছেন। বৃক্ষও পচনশীল। তবে আমরা তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় কাঠ তৈরী করছি। সেই ভাবে দেখলে তো মানুষকেও মমি বানানো সম্ভব।

আমি বললাম,
-আপনার যুক্তিকে মেনে নিচ্ছি। এখন বলুন, প্রানীর মমিকৃত দেহটির মাঝে বা কাঠের মাঝেও কি "বোধ" কাজ করছে।
প্রভাতদা বললেন,
-কাজ না করবার কোন কারণ নেই, তবে সেটা চতুর্মাত্রিক জগত দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত জড় পদার্থের "বোধ" এবং বিভিন্ন জড়পদার্থ ও বিভিন্ন প্রানীর "বোধ"এরও মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন এবং আমি মনে করি

প্রানীর দেহ থেকে "অন্তর্বোধ"এর প্রয়ানের পর, খোলস বা দেহাবশেষ থেকে উৎপন্ন জড় পদার্থের "বোধ" সর্বনিম্ন পর্যায়ের। চতুর্মাত্রিক বিশ্বের আইন অনুযায়ী জড় পদার্থ এবং প্রানীর পার্থক্য কি হ'তে পারে বলে মনে হয়।

আমি বললাম,
-এই সাবজেক্ট আমার জন্য একেবারেই নতুন, কখনোই ভাবিনি। আপনি আপনার ভাবনাটুকু পাঠাতে পারেন।

দাদা যেন আমার এই প্রশ্নের জন্য তৈরী হ'য়ে বসেই ছিলেন, কথাটা বলা শেষ করেছি মাত্র, প্রভাতদা পাঠাতে শুরু করলেন তার ভাবনা গুলো,
-১) জড় পদার্থের "অন্তর্বোধ" নেই, প্রানীর আছে।
২) জড় পদার্থের "বোধ"এর কাছে জড় পদার্থের যুক্তিই দেয়া আছে, আর প্রানীর "বোধ"এর কাছে প্রানীর যুক্তি দেয়া আছে।
৩) জড় পদার্থের কমিউনিকেশন ক্যাপাসিটি নেই, রিপ্রোডাকশন প্রয়োজনীয়তা নেই এবং কর্ম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নেই। যে কারণে জড় পদার্থের নিজস্ব এনার্জির বাইরে আর কোন এনার্জির প্রয়োজন নেই, প্রানীর আছে।
৪) আমাদের পৃথিবী আমরা তৈরী করতে যেয়ে সম্পুর্ণ সত্যের চেয়ে সার্ভাইভল ফর দা ফিটেস্ট থিয়োরিকে এবং পূণপৌণিকতা কে প্রাধান্য দেই। জড় পদার্থের সেই সমস্যা গুলো নেই।

আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম,
-আপনি কিসব সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল" বকে চলেছেন। সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টির সাথে অন্যান্য প্রানীরই যেখানে তুলনা চলেনা সেখানে আপনি জড় পদার্থকে একই পাল্লায় টেনে আনছেন।

প্রভাতদা আমার কথাকে মনে হল "রাবিশ" বলে উড়িয়ে দিলেন, বললেন,
-সব সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার এবং সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন যার যার প্রয়োজনের জন্যই কিন্তু আপনি কোন একটা কিছুর ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না বলে তো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকেই বাতিল করে দিতে পারেন না। কিছু উদাহরণ দিয়ে আপনার ব্যাখ্যা তৈরীতে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করা যাক। জড় পদার্থ এবং প্রানী এই বিশ্বে একই আইনে চলছে কিন্তু তাদের ভার্সন পৃথক। যেমন একটা কম্পিউটারের কথাই ধরা যাক, কম্পিউটারের উইন্ডোজের বিভিন্ন ভার্সন আছে, সবই উইন্ডোজ কিন্তু পরের ভার্সন গুলো আপগ্রেডেড। অনেক প্রোগ্রামই আপনি পুরনো ভার্সনে চালাতে পারবেন না। আবার আপনি যে লেটেস্ট ভার্সনে রয়েছেন সেই ভার্সন যে একই কর্মক্ষমতা আছে সেটা নাও হ'তে পারে, হয়তো কিছু কাজ আছে যেটা অন্য ভার্সনে অনেক সহজবোধ্য ছিল। এখন আমাকে বলুন, আপনি কি নিশ্চিত যে, এই বিশ্বে মানুষ যা দেখছে সেটাই চুড়ান্ত সত্য। আমি মনে করি, আমরা যা দেখছি বা করছি এটাই শেষ সত্য নয়। যেমন ধরুন, মানুষের মাত্র তিনটি কালার রিসেপ্টর আছে কিন্তু এই বিশ্বে বহু পাখি, প্রজাপতির, চিংড়ি মাছের চার থেকে পনেরোটা পর্যন্ত কালার রিসেপ্টর আছে। আবার পাইথন সহ অনেক সাপের ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রাম গ্রহণ করার লেন্স আছে। অর্থাৎ, এই বিশ্বে এমন কিছু রং আছে যা ঐ পাখি, প্রজাপতি বা চিংড়িমাছের জানা আছে কিন্তু আমাদের জানা নেই এবং আমাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে, কমিনিকেশনের সংগ্রামে বা রিপ্রোডাকশনের সংগ্রামে সেই রংয়ের প্রয়োজন নেই, অথবা পাইথনের বেঁচে থাকার বা রিপ্রোডাকশনের জন্য ইনফ্রারেড আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবী হয়তো প্রয়োজন কিন্তু আমাদের

কাছে সেগুলো দৃশ্যমান হবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এবার আপনি একেকটি ভার্সনের উইন্ডোজের সকল কম্পিউটারকে একেকটি প্রজাতি ধরে মিলিয়ে যেতে থাকুন...

আমি এবার একটু বিরক্তই হ'য়ে দাদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,
-রাখুনতো আপনার এসব সৃষ্টি ছাড়া কথা বার্তা। জড় পদার্থ, পাখী, প্রজাপতি, চিংড়িমাছ, সাপ-খোপ, মানুষ সব একই পাল্লায় মাপার কোন যুক্তিই নেই।
প্রভাতদা বললেন,
নাহ, আপনি এখনো যুক্তির দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোয়ান্টামের জগতে আসুন, "বোধ" এর জগত ছেড়ে "অন্তর্বোধ" কে সজাগ করার চেষ্টা করুন, আপনার মনের ইচ্ছেমত নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে ঘুরে বেড়ান, আপনার মনের সকল সাধ পুরন করুন। আপনার এখন কি খেতে ইচ্ছে করছে? দুধের নহরের পাশে বসে দুধ পান করবেন কি? শুধু ভাবুন, ইচ্ছে পুরণ হয়ে যাবে আপনার।

আমি বললাম,
-আমি কিছুই চাইছিনা, আমি ফিরে যেতে চাইছি আমার পরিচিত চতুর্মাত্রিক জগতে, চাইছি হাজার বছরের এই সময়ের সমাপ্তি।
উনি বললেন,
-গুড, আপনার "বোধ" এখনো কাজ করছে। এটা ভাল চাওয়া, শুধু ভাববেন না আপনার মৃত্যু হয়েছে।

কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। হঠাৎ মনে হল, কোয়ান্টাম জগতেই যদি থাকি এবং যদি আমার "বোধ" ও "অন্তর্বোধ" এর দ্বন্দ্বে যদি "বোধ" জয়ী হয়ে "অন্তর্বোধ" কে বুঝিয়েই ফেলে থাকে আমার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে "অন্তর্বোধ" সেই মৃত্যুকে কতক্ষণ আটকিয়ে রাখতে পারবে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ সেকেন্ডের কত ভগ্নাংশে নির্ধারিত হয়। সাথে সাথেই প্রভাতদার কন্ঠ ভেসে এলো,
-বললাম না, এবারের ভ্রমনে মৃত্যু চিন্তা বাদ।
আমি বললাম,
-ঠিক আছে, তাহলে আমরা কথার মাঝেই থাকি। আচ্ছা বলুন তো আপনি সাইন্সের মানুষ হয়ে এতো ফিলসফি ঝাড়ছেন কেন।

## প্রভাতদার ফিলসফির গপ্পো

এই যন্ত্র থেকে আমাকে জীবিত ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় প্রভাতদাকে মনে হয় কথা বলার রোগে ধরেছে, হড়বড় ক'রে বলা শুরু করলেন,
-আর বলবেন না, ঐ যে এক ফিলসফার নিয়ে এই যন্ত্রে এসেছিলাম, ফিলসফির অদ্ভুত ভাবনা গুলো তখন থেকেই নিজের মাঝে ঢুকে যাবার কারণে আমি একটা জিনিষ বুঝেছি, ফিলসফিই শেষ কথা নয়। আমার মত যারা পদার্থবিদ, তারা যেমন তাদের নিজেদের ব্যাখ্যার স্বার্থে যখন যেমন ইচ্ছে থিয়োরী সাজাচ্ছে, ফিলসফারদেরও গতানুগতিকতার বাইরে যেয়ে ভাবতে বললেই যা ইচ্ছে তাই বকে চলে। কারো কোন প্রমানের দায়ীত্ব নেই। ঠিক আছে, বুঝেছি বুঝেছি, আপনার এসব প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না। আসুন তারচেয়ে বরং ম্যাকায়াভেলির কোটেশন যেটা দিয়েছিলাম "শুধু মানুষের আবেগের ওপর নির্ভর করা মানেই হল ক্ষরস্রোতা বহমান নদীর তীরের বালির বাধের ওপর ইমারত নির্মান করা, মানুষ অতীতকে সহজেই ভুলে যায় এবং বর্তমানকে নিয়ে থাকতেই বেশী পছন্দ করে।" সেটা নিয়ে আলাপ করি।

আমি বললাম,
-কেন যেন ম্যাকেয়াভেলির কাছেও যেতে ইচ্ছে করছে না এখন।
প্রভাতদা বললেন,
ঠিক আছে, বাদ দিন। আমাকে কেউ যখন জিজ্ঞেস করে আমি কোন ধর্ম পালন করি, তখন আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমার ধর্ম দিয়ে তোমার কাজ কি? মানুষ যে ভাবে বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হ'য়ে মানবভোজী মাৎসান্যায় অবস্থা তৈরী ক'রে একে অপরের ধ্বংস কামনা করছে তাতে এক সময় পুরো মানবজাতিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম,
-থাক থাক, তারচেয়ে আপনি ম্যাকায়াভেলির কথাই বলুন।
প্রভাতদা বললেন,
-আমি শুধু আপনাকে যুক্তির পৃথিবীতে রাখতে চাইছি। ম্যাকেয়াভেলির ঐ কোটেশনের ওপর একটা লেখা আমি লিখেছিলাম আপনাকে দেবো বলে, সেটাও আপনাকে বলি।
আমি বললাম,
আপনার ইচ্ছে, বলতে থাকুন।

প্রভাতদা আমার ভাবনায় নিজের ভাবনা গুলো ঠেলে দিতে থাকলেন,
-ম্যাকায়াভেলি জীবনে খুব কষ্ট করেছেন। কিন্তু তিনি ঐ যুগের রাজা-রাজরাদের শাসন ভাল মনে করতেন, সেই কারণে তাকে ডানপন্থী রাজনীতিবিদ বললে ভুল হবেনা। এই কোটেশনটিতে তিনি জনগনের ওপর অনাস্থা এনেছেন কিন্তু বিশ্বাস করুন, উনি মানুষ এবং সুবিধাভোগী-মানুষ এই দুইটি বিষয় গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

আমি প্রভাতদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,
-আপনার মুখে সাইন্স শুনতে ভাল লাগে, এসব না। তারপরও শুধুই নিজে বুঝবার জন্যই জিজ্ঞেস করছি, ম্যাকায়াভেলিকে আপনি ডানপন্থী বলছেন কেন?? ডানপন্থী বলতে আমি বুঝি মৌলবাদী অথবা মৌলবাদের সমর্থক। আমার জানা মতে উনি দু'টির একটিও ছিলেন না, খুব কড়া ভাষা যদি প্রয়োগ করতে চান তবে সর্বোচ্চ "প্রতিক্রিয়াশীল" শব্দটি বলতে পারেন।

প্রভাতদা বেশ মজা করে বলে উঠলেন,
-দিলেন তো ঠেলে প্যাঁচের মধ্যে। আগে আমাকে মৌলবাদের ডেফিনেশন দিন।
আমি বললাম,
-তর্কের জন্য আপনি যদি এই প্রসঙ্গ তুলে থাকেন তাহলে প্রসঙ্গটার এখানেই সমাপ্তি টানুন।
দাদা বললেন,
-তর্ক কোথায় পেলেন, আমি আপনার মতামত চাইছি।

আমি বললাম,
-আমার মতামত খুব সহজ। ধর্ম দুইটি ধারায় এগিয়ে চলেছে,
১) আব্লিক
২) মৌলিক

আব্রিক ধারার মানুষেরা সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে চলেছে অন্তর্মুখিতার মাঝে আর মৌলিকতার অনুসারীরা তাদের সকল কর্মের মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে অনুসন্ধানে ব্যাস্ত, তারা মনে করছে, ধর্মের জন্যই মানুষের সৃষ্টি।
প্রভাতদা বললেন,
-আপনি কোনটা সঠিক বলে মনে করেন?

আমি হেসে ফেললাম, বললাম,
-এটা কোন প্রশ্ন হল। কাক আর কোকিলের গল্পের কথাই ধরুন,
দুটোই পাখী। কাকও কালো, কোকিলও কালো। কিন্তু কয়েকটি মারাত্মক জটিলতার কথা বলি,
১) একজনের গলার স্বর মধুর হলেও গাছের পাতার আড়ালে আবডালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, অন্যজনের কর্কশ গলার শব্দে জীবন অতীষ্ট হলেও থাকে জনসমক্ষে।
২) একজনের নিজের বাড়ির ঠিকানা নেই, অন্যজন সেই কোকিলের ডিম ফোটায় নিজের বাড়িতে।
৩) একজন শুধু সুসময়ের, অন্যজন সকল সময়ের।
৪) একজন কি খায় সেটা জানা যায় খুব কম, আরেকজন আবার যা পায় তাই খায়।
এখন খারাপ ভালোর সিদ্ধান্ত কি হতে পারে? সুতরাং, কোন ধারাটি সঠিক সেটি নির্ধারণ করার জন্য যে সৃষ্টিকর্তা আমাকে সৃষ্টি করেননি সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

প্রভাতদা অনেক্ষণ চুপ থেকে বললেন,
-তাহলে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন।
আমি বললাম,
-আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি শুধুই আমার মতামত দিতে পারি।
উনি বললেন,
-আমি আপনার মতামতটুকুই জানতে চাইছি।
আমি বললাম,
-খুবই সরল পথ আমার। সৃষ্টিকর্তাকে খোঁজা অথবা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি সমূহকে বোঝা আমার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বরং একক সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করে সৃষ্টিকর্তার সকল সৃষ্টিকে পুণঃপৌনিকতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করাই মানুষের মূল দায়ীত্ব।

দাদা বেশ গভীর স্বরে বললেন,
-আপনি আপনার কথা গুলো বুঝে বলছেন তো।
আমি বললাম,
-এই সন্দেহ কেন জাগলো আপনার মনে বুঝলাম না।

দাদা আবারও চুপ। অনেক্ষণ পর বললেন,
-তাহলে তো আপনার ভাবনা আর আমার ভাবনা একই যায়গায় আছে, এমনকি আমি যে লেখাটা আপনাকে দেব বলে লিখেছিলাম, সেটাও প্রায় একই তত্বের ওপর লেখা, তাই কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।
আমি হেসে ফেললাম,
-অবাক হবার কি আছে। আমরা এন্ট্যাঙ্গেল্ড অবস্থায় সমষ্টিগত ভাবনার স্তরে আছি, আপনার ভাবনা তো আমি এখন ইচ্ছে করলেই চুরি ক'রে নিতে পারি।

দাদাকে এবার বেশ খুশী মনে হল,
-আপনাকে এতোক্ষণ কেমন যেন হতাশ মনে হচ্ছিল। আপনার হাসির শব্দে আশ্বস্ত হলাম। তেমন কিছু হিসেব ক'রে আপনাকে প্রশ্নটি করিনি। "সময়"এর সাইন্টিফিক ডেফিনিশন খুব দুর্বল তত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই দূর্বল সময়ের মাঝে আপনি যাতে হারিয়ে না যান সেই চেষ্টায় প্রশ্নটি করেছিলাম বলতে পারেন।

আমিই তাকে এবার আশ্বস্ত ক'রে বললাম,
-আপনার এই গবেষনাগারে সময়ের অর্থই যেখানে বদলে দিয়েছেন সেখানে "সময় কিছু না" বলে সময়কে গুরুত্বহীন মনে করে শুধুই গল্পে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি ঠিক আছি। আসলে কথা বলায় কেন যেন কোন আগ্রহ পাচ্ছি না। আপনি বরং আপনার লেখার কথা বলুন।

দাদা আর কথা না বাড়িয়ে আমাকে তার লেখা পাঠাতে শুরু করলেন,
-একজন মানুষ জন্মেছে আজ। মাত্র কয়েক ঘরের দ্বীপে শ'খানেক মানুষের একটি বসতি। এই জনশুন্যতা তার মাঝে তৈরী করেছে মানুষের সঙ্গ পাবার এক তীব্র আকাঙ্খা, তার মন শুধুই খুঁযে বেড়ায় মানুষ। সে চলে যায় জনপদ থেকে জনপদে, গ্রাম থেকে গঞ্জে। যেখানেই মানুষ পায় গল্প করে, আপন ক'রে কাছে টেনে নেয়ার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে কি ভাবে মানুষকে আরও কাছে টানা যায়, কিভাবে মানুষের উপকার করা যায়। একসময় সে তার নিজের অজান্তেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পরে। নিজের অজান্তেই কারণ, তার জানা ছিলনা যে, রাজনীতি মানেই মানুষকে একটি আদর্শের উপর সংগঠিত করা, রাজনীতি মানেই মানুষকে ভালবাসা। লোকটি মানুষের মনের কথা, মুখের ভাষাকে বাস্তবায়ীত করতে জীবন বাজি রেখে ঝাপিয়ে পরে। এক সময় সে বুঝতে পারে, মানুষের ইচ্ছে বাস্তবায়নে প্রয়োজন ক্ষমতার। ক্ষমতার জন্য সে মানুষের দুয়ারেই হাজির হয়, মানুষও তাকে সুযোগ করে দেয় এগিয়ে যাবার। মানুষের জন্য ক্ষমতার দূয়ারে মাথা ঠুকতে যেয়ে ক্ষমতাই যেন তার মাথায় ঠোকর বসাতে শুরু করে। কিন্ত মানুষটি ছিল ভীষন জেদী, সে দমে যাবার পাত্র নয়। ক্ষমতার সাথে অসম দ্বন্দ্বে পরাজয় স্বীকার না করে ঝাপিয়ে পরে মানুষের মুক্তির লক্ষে। এক সময় পরাজিত হয় অশুভ চক্র, বিজয়ীর বেশে সে ফিরে আসে আপন মানুষের মাঝে।

প্রভাতদার লেখা চলছে,
-এরপর একদিন সে উপলব্ধি করলো, মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে সে ভুলেই গিয়েছিল যে, সেও ঐ মানুষ গুলোর মতোই একজন মানুষ এবং মানুষ হিসেবে নিজের সংসারের প্রতি তার কিছু দায়ীত্ব নির্ধারিত করা আছে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক। কিন্ত ততদিনে তার সংসার, তার আপনজন সবই অন্য সব মানুষের সাথে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছে। দু:খ ছিলনা তার সেটাতেও কিন্ত হঠাৎ একদিন সে অনুভব করলো, মানুষের মতই দেখতে কিছু কিছু জটিল, স্বার্থপর, অন্তঃশত্রু তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে, যারা সর্বক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার ভালবাসার সেই সাধারণ মানুষ গুলোর জন্য অর্জিত মুক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে। সবই সে বুঝলো কিন্ত ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। নিয়তি তাকে বাধ্য করলো ইহজাগতিক হিসাব নিকাশ শেষ করতে, বাধ্য করলো তার ইহজাগতিক সকল চাওয়া-পাওয়ার পরিসমাপ্তি টানতে। চলে যাবার আগে তার মনে প্রশ্ন জাগলো, সে কোথায় যাচ্ছে? উত্তর পেল, সে জানে না। এই অজানার উপলব্ধিতে ভয় পেয়েছিল কি সে? নাহ, নির্ভিক যোদ্ধা সে। সারা জীবন অজানা ভয়কে জয় করে নিজের পথ নিজেই করে নিয়েছে, তার বিশ্বাস আগামীর অজানা পথও সে নিজেই খুঁজে বের করতে পারবে। তারপর তার উপলব্ধিতে এলো, অজানা

ভয়কে সে জয় করেছিল ঠিকই কিন্তু অজানাকে জয় করতে পারেনি। এই বিশ্বের সব কিছুই প্রায় অজানা অবস্থাতেই সে বিদায় নিল এই বিশ্ব থেকে।

প্রভাতদা তার লেখা আমার ভাবনায় পাঠিয়ে চলেছেন,
-তার বিদায়ের পর, সেই মানুষরূপী স্বার্থপর শকুনের দল তারই ভালবাসা সেই সাধারন মানুষ গুলোকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করা শুরু করলো। কিন্তু সাধারন মানুষ তারই শিখিয়ে দেয়া মন্ত্রে আবার ঐক্যবদ্ধ হল। ঐক্যবদ্ধ জনগন সৃষ্টি করলো তারই সংসারের, তারই মত আরেকজনকে। এই সংসার সেই সংসার, যে সংসারের প্রতি উদাসীনতার কারণে যাদের জন্য সেই মানুষটি কিছুই প্রায় করে যেতে পারেনি। এই আরেকজনও জন্ম নিল তার জন্য সম্পুর্ন অপরিচিত এক পরিবেশে এবং যে কারণে তার কাছে সেটাই প্রায় জন শুন্য একটি দ্বীপ। সেই নবজন্মের আরেকজনও, মানুষের জন্য, মানুষকেই সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলো সকল অজানা ভয়কে জয় করে, "অজানা" "ভয়"কে "জয়" করে, অ-জা-না ভ-য়-কে জ-য় করে। তার কাছেও কি বিশ্বের সব কিছুই অজানা থেকে যাবে। ঐ মানুষটির মত এই আরেকজনেরও এক সময় উপলব্ধিতে এলো তার চারপাশে মানুষরূপী স্বার্থপর, অন্তঃশত্রু শকুনের দল ঘিরে আছে। বুঝতে তো পারলো কিন্তু সেই আগের মানুষের মত আরেকজনও কি পুণঃপৌণিকতার এই ইতিহাসেই চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই...?

দাদার লেখাটি খারাপ লাগলো না। গল্প নেই কিন্তু আবার গল্প আছে। লেখাটিকে কি ভাবে ডিফাইন করবো বুঝতে পারছিনা। সাইন্টিফিক স্পিরিচুয়ালিটি বললে না আবার দাদার আঁতে ঘা লাগে। রবি বাবু ছোট গল্পের সংজ্ঞা নির্ধারন করেছেন "হইয়াও হইলো না শেষ"। কিন্তু উনি শেষ তো করেনইনি, উলটো প্রশ্ন বোধকের পর প্রশ্ন বোধক দিয়ে শেষ করেছেন, আবার বলা যায় লেখাটি কখন শুরু করেছেন সেটাই বুঝলাম না, শেষ হবে কি ক'রে। লেখাটির কোন নামও দেননি উনি, নামকরণ ছাড়া সব লেখাই অসম্পূর্ণ মনে হয় অন্তত আমার কাছে। দাদা জেনে নিলেন আমার মনের কথা গুলো, বললেন,
-লেখার নাম বা সংজ্ঞা নিয়ে এতো মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আমি লিখেছি কেন সেটাই আমি জানি না।

আমি বললাম,
-এটাই একজন শিল্পী বা লেখকের সংজ্ঞা, তাদের সৃষ্টিতেই আনন্দ। আপনার লেখাটি শোনার পর জানা অজানার দ্বন্দ্বের কারণেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, কেমন যেন নিজের মাঝে একটা একাকীত্বের মন খারাপ করা অনুভূতি কাজ করছে। আপনি কি লেখাটা এই যন্ত্রে প্রথমবার উঠবার আগে লিখেছেন, নাকি পরে।
দাদা বেশ অবাক হ'য়ে বললেন,
-এই প্রশ্ন কেন করলেন জানি না, তবে লিখেছি সেই ফিলসফারকে নিয়ে যন্ত্রে ওঠার পর।

আমি বললাম,
-আপনি যখন প্রথমবার এই যন্ত্রে উঠেছিলেন তখন কি আপনার মাঝে কোন আজানার ভয় কাজ করেছিল?
দাদা বললেন,
-নাহ বরং অজানাকে জানার উত্তেজনা কাজ করছিল।
আমি বললাম,
-আপনার মাঝে আজকের এই ভ্রমনের সাথে প্রথম দিনের ভ্রমনের পার্থক্য আছে কি কোন?

দাদা বললেন,
-হ্যা আছে। আজকের ভ্রমনে কেমন যেন ক্লান্তি এসে ভর করতে চাইছে নিজের ওপর। মনে হচ্ছে যেন, অপেক্ষার এই দীর্ঘ সময়টুকু শেষ হবার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় আছি আমি।
আমি বললাম,
-বাহ, বেশ কবির ভাষায় বললেন তো।

আমার মনে হল আমিই এখন চেষ্টা করে চলেছি দাদাকে হারিয়ে যেতে না দেবার জন্য। ওনার কথায় বার্তায় কেমন যেন একটা ঔদাসীন্যতার ছোঁয়া পেয়ে চলেছি। অনেক্ষণ অপেক্ষার পর আমি বললাম,
-আপনি আছেন তো আমার সাথে?
দাদা ছোট্ট করে উত্তর দিলেন,
-হ্যা।
আমি বললাম,
-অপেক্ষা কখন প্রতীক্ষা হয় জানেন? যখন কেউ তার ভালবাসার জন্য অপেক্ষা করে তখনই সেটা প্রতীক্ষা হয়ে যায়। আপনি কোন ভালবাসার প্রতীক্ষায় আছেন।

দাদা অনেক্ষণ মনে হল শুন্য ভাবনার জগতে আছেন, তারপর দীর্ঘ নিশ্বাসের জগত থেকে বললেন,
-আমার মূল ভালবাসার যায়গাটা বুঝবার আগেই হারিয়ে ফেলেছি, এখন বিজ্ঞানকে ভালবেসে হয়তো পৌঁছাতে চাইছি মূল ভালবাসার কাছে। হয়তো এজন্যই এই সময় শেষের প্রতীক্ষায় আছি।

প্রভাতদাকে তার দীর্ঘ নিশ্বাসের জগত থেকে বের করে আনবার চেষ্টায় আমি বললাম,
-ফিরে গিয়েই কিন্তু আজ লাঞ্চ করবো আমরা এক সাথে, মনে আছে তো।
উনি বললেন,
-নাহ, অনেক কাজ জমে আছে। লাঞ্চের সময় নেই। আপনি আজ যে কম্বাইন্ড থিয়োরী দিয়ে ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশনের কথা বললেন, সেটা আমার খুব গ্রহনযোগ্য মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার টীমের সাথে বসে আজই আমরা একটা সমাধানে পৌঁছাতে পারবো।

এবার আমার অবাক হবার পালা,
-আমি আবার কখন কম্বাইন্ড থিয়োরী দিলাম।
উনি বললেন,
-আপনিই তো বললেন, একই সাথে হয়তো আমরা আমাদের নির্ধারিত টার্গেট অনুযায়ী ঠিকই হয়তো ব্ল্যাকহোল, কোয়ামটাম জগত ইত্যাদি তৈরী করেছি এবং কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্স ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশনের সম্ভবনাও যে তৈরী করেছে সেটা আপনি বলার আগে খেয়ালই করিনি। এখন শুধু সময়ের এই অপেক্ষা বা প্রতীক্ষার প্রহর কমাবার একটা ব্যাবস্থা করতে পারলেই এবং কোয়ান্টাম থিয়োরীতে তৈরী হওয়া বস্তুর সুপার পজিশন সমস্যার একটা সমাধান বের করতে পারলেই এই যন্ত্রের একটা ব্যবহারিক উপযোগীতা পাওয়া যাবে। আপনি বুঝতে পারছেন না বিজ্ঞানের জন্য এটা কত বড় একটা ব্রেকথ্রু। “স্টারট্রেক” এর এই আইডিয়া যদি আমরা সঠিক প্রমাণীত করতে পারি তাহলে আগামী বিশ্ব কত তাড়াতাড়ি কোথায় চলে যাবে সেটা আপনার ধারনাতেও নেই।

নাহ, বুঝে নিলাম দাদা আমার ফিরে এসেছেন নিজ ভূবনে। আর ভয় নেই, প্রতীক্ষা শেষে ঠিকই ফিরে যাবো আমার আপন পৃথিবীতে, দাদাকে সহ। আপন পৃথিবী?????

**<u>যন্ত্র থেকে ফিরে আসার গপ্পো</u>**

প্রভাতদার অভিজ্ঞতা থেকে বলা সেই ওজন ফিরে পাওয়া থেকে শুরু করে সবই এক সময় ঘটা শুরু করলো। বুঝলাম আমরা ফিরে চলেছি। ফিরে এলাম, ফিরে এলাম, ফিরে এলাম। সত্যজিত রায়ের গুপী গাইনের মত বেসুরো গলায় মনটা যেন গেয়ে উঠলো "আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে"। ফিরে আসার উত্তেজনায় ভুলেই গেলাম দাদার কথা মত মনে মনে হাত তুলবার কথা। প্রথমেই মনের চোখ যেয়ে পরলো হেলমেটে থাকা ঘড়িটির ওপর। মনে হল ক্লিক করে সেকেন্ডের ঘরটি পরিবর্তিত হল, রিডিং, ১২ঃ৩৫ঃ৩২। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ শেষে আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি।

চোখ মেলে প্রথমেই নজরে পরলো, আতিক তার স্বভাব সুলভ হাসি হাসি মুখে দাদার ল্যাবের কাঁচের দরোজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলছে,
-কেমন দেখলে সার্ন।

হ্যা, আতিকের জন্য আগেই সার্নে ঢোকার পাস রেখে দিয়েছিলেন প্রভাতদা। আমরা ছোট্ট চেম্বারটিতে ঢোকার আগেই চলে এসেছে সে সার্নে। আমি হতবিহবল দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি আতিকের দিকে। আতিকের হাসিটা যে এতো মিষ্টি সেটা তো আগে কখনো খেয়াল করিনি। তারপর দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম,
-যা দেখার দেখেছি। দ্বিতীয়বার আর দেখার ইচ্ছে নেই। চল, তাড়াতাড়ি চল এখান থেকে, ভীষন ক্ষীধে পেয়েছে। প্রভাতদা যাবে না আমাদের সাথে, ওনার অনেক কাজ আছে।

আতিক বিস্ময় ভরা কন্ঠে বললো,
-সেকি দাদা, লাঞ্চ ক্যান্সেল করলেন কেন, আপনার তো কখনো রাগ-ক্ষোভের বালাই ছিল না। গতরাতের কোন কথায় মাইন্ড করলেন নাকি।
প্রভাতদা বললেন,
-গতকাল রাতে আবার কি ঘটেছিল? আতিক, তোমার ভাই ঠিকই বলেছে। হঠাৎ কিছু কাজ জমেছে। আমার টীম রবিবারেও কাজ করে, তাদের সাথে যদি আজকের এক্সপেরিমেন্টটার তথ্য গুলো নিয়ে না বসি তবে অনেক পিছিয়ে যাবো।

কথা আর বাড়তে দেবার ইচ্ছে নেই। ক্ষিধে পেয়েছে কি পায়নি সেটা কোন বিষয়ই নয়। সার্ন থেকে বের হওয়াটা আসল কথা। কি ভুতুরে যায়গারে বাবা।
চলে এলাম "সার্ন" ছেড়ে।

আতিক আর আমি গাড়িতে বসার আগেই দেখি অংকের সব জটিলতা মাথার ভেতরে কিলবিল করছে। বুঝলাম দাদা ও তার দল-বল বসে গিয়েছে তাদের কাজে। এইসব ম্যাথেমেটিকাল জটিলতা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় বেশ কয়েকবার নিজের মাথায় নিজে বাড়ি দেবার পর আতিক জিজ্ঞেস করলো,
-তোমার কি মাথা ব্যাথা করছে, ওষুধ দেবো?

আমি উত্তর দিলাম,
-নাহ, ওষুধ লাগবে না। দাদার ল্যাবে যেয়ে মাথাটা আউলা ঝাউলা হ'য়ে গিয়েছে।

এই কথা বলতে বলতেই মনে হল, মাথাটা ঠিক যায়গায় আছে তো। মাথা-মুখে এবার আলতো করে হাত ছুঁইয়ে নিশ্চিত হলাম যে, নাহ, সব কিছু যায়গাতেই আছে। আতিককে বললাম,
-আমার ফেরার ফ্লাইট আগামীকাল সকাল এগারোটায়। তুই আগামীকাল অফিসে যখনই যাবি আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

আতিক মনে হল একটু দুঃখ বোধ থেকেই বললো,
-কবে তোমাকে এয়ারপোর্টে তুলতে বা নামিয়ে দিতে যাইনি। কিন্ত তোমার এতো তাড়াহুড়ো করে ঢাকায় ফিরে যাবার দরকার কি, আরও দু'দিন থেকে যাও।
আমি বললাম,
-নাহ, আরেকবার আসবো না হয়। তোর ভাবী-ভাতিজাদের অনেকদিন দেখি না।
আতিক অবাক হয়ে বললো,
-সেকি কথা। তুমি তো ঢাকা থেকে এলেই গতকাল।

হায়রে কপাল। কিভাবে বোঝাবো আতিককে যে, ওর গতকালের সাথে আমার গতকালের হাজার বছরের ফারাক। আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। আতিক আমার ব্যবহারে কিছু একটা সমস্যা খুঁজে পেলো বোধহয়। বেশ উতলা ভঙ্গিতে বললো,
-সার্নে কিছু ঘটেছে নাকি, প্রভাতদা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে নাকি? ওনার কোন কথাকে পাত্তা দিওনা। উনি এমনিতেই একটু ক্ষ্যাপাটে মানুষ।
আমি বাধা দিয়ে বললাম,
-সাবধান, প্রভাতদা তোর কথা শুনতে না পেলেও আমার কথায় বুঝে নেবে তুই কি বলেছিস। দা এবং আমি এন্ট্যাঙ্গেল্ড অবস্থায় আছি।
আতিক অবাক বিস্ময় নিয়ে বললো,
-এন্ট্যাঙ্গেল্ড অবস্থা! সেটা আবার কি ভাবে সম্ভব!

ওকে এসব বোঝাবার কোন ইচ্ছেই এখন করলো না, বললাম,
-ওসব জানার বা বোঝার কিছু নেই, শুধু প্রভাতদার প্রসঙ্গে কোন আলাপ এখন না।
আতিক হেসে দিয়ে বললো,
-আরে নাহ। আমাকে দাদার লোকাল গার্জিয়ান বলতে পারো। দাদাকে আমি বকাঝকা করি মাঝে মাঝেই। উনি আমার বকাঝকায় কিছু মনে করেন না, উনি জানেন আমি ওনাকে কতটা পছন্দ করি।

আমি ভাবলাম, হ্যা এবার ঠিক আছে। তারপরই মাথার গভীরতম অঞ্চল থেকে দাদার হাসির শব্দ শুনতে পেলাম যেন। ততক্ষণে আমরা দু'ভাই একটা রেস্টুরেন্টে যেয়ে লাঞ্চে বসেছি। আমি আর কোন কথায় নিজেকে না জড়িয়ে খাবারের প্রতি সমস্ত মনযোগ একত্রিত করে শুধুই খাবারের প্রশংসা করতে করতে লাঞ্চ শেষ করে বাসায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই দেখি মাথার ভেতরে কাজ করে চলা সেই অংকের জটিলতা গুলো বিদায় নিয়েছে। আমি আতিককে বললাম,
-সার্নে খবর নিয়ে দেখতো দাদা ঠিক আছেন কিনা।
আতিক বললো,

-আমরা সার্ন থেকে এলামই তো এই ঘন্টা তিন/চারেক। এরমধ্যে আবার কি হবে। তাছাড়া কিছু হলে সার্ন থেকেই আমাকে ফোন করবে। বললামই তো, লোকাল কনটাক্ট হিসেবে আমার নাম্বার দেয়া আছে সার্নে।

আমি আতিককে জোড় করেই ফোন করালাম সার্নে। নাহ, প্রভাতদা ভাল আছেন। প্রভাতদার সাথে কথা বলে ফোন রেখে আতিক বললো,
-দাদা এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, বললেন, তোমার মাথা থাপড়ানো বন্ধ হয়েছে কিনা। উনি জানলেন কি করে যে, তুমি সার্ন থেকে বেড়িয়ে এসে কিছুক্ষণ পরপরই মাথা থাপড়িয়েছো।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। বুঝলাম ক্ষ্যাপা প্রভাতদা আবার যন্ত্রটিতে উঠেছেন কাউকে সাথে নিয়ে। পরের দিন চলে এলাম জেনেভা থেকে বাংলাদেশে, নিজের বাড়িতে। হোম সুইট হোম।

**<u>আরেকটি সন্ধ্যার গপ্পো</u>**

সার্ন থেকে ফিরে আসার পর প্রায় বছর দু'য়েক কেটে গিয়েছে। সার্ন থেকে ফিরে আসবার পর আমার সমস্ত কিছুই বদলে গিয়েছে। এখন আমার আর কোন দিকে খেয়াল করবার সময়ই নাই। ঘর-সংসার আর আশেপাশের পরিচিত মানুষ নিয়েই ব্যস্ত আমি। প্রভাতদার স্মৃতিও বেশ ঝাপসা। আতিকের সাথে কথা বলার সময় প্রভাতদাকে নিয়ে যে একেবারে আলাপ হয়নি তা নয়।

এক শনিবারে বাসায় বসে বাচ্চাদের সাথে খুনসুটি করাছি, হঠাৎ প্রভাতদার ফোন পেলাম। গলায় আন্তরিকতা শুধু নয় একেবারে অন্তরের ছোঁয়া। মনেই হল না যে বহুদিন ওনার সাথে কোন যোগাযোগ নেই। প্রায় নির্দেশের সূরে বললেন,
-আতিকের কাছ থেকে আপনার ইমেইল এড্রেস আর ফোন নাম্বার নিয়ে আপনার মেইলে আগামীকালের জেনেভা-ঢাকা-জেনেভার একটা টিকেট পাঠিয়েছি। আগামীকাল বিকেলে জেনেভা পৌঁছাবেন আপনি। আতিক আপনাকে রিসিভ করে আমার বাসায় নিয়ে আসবে। একসাথে বসে এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন, পরের দিন আবার ফিরিতি ফ্লাইটে ঢাকা চলে যাবেন না হয়। মাঝে একদিনেরই ব্যাপার, চলে আসুন।

আমি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বললাম,
-আসতে তো অসুবিধে নেই কিন্তু আমি আপনার যন্ত্রে আর কখনোই চড়তে রাজি নই।
দাদা হেসে বললেন,
-আপনাকে যন্ত্রে চড়তে হবে না। দুই প্রভাতের আরেকটি সন্ধ্যা, এক সাথে বসে বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে কিছু গল্প, ব্যাস, আর কিছুই না।
আমি বললাম,
-শুধু গল্পের জন্য এতোদূর কেন, ফোনেই বলুন।
দাদা কিছুটা অধৈর্য হয়ে বললেন,
-আহা, ফোনেই যদি সব কাজ সারা যেতো তাহলে তো এয়ারলাইন্স গুলোর ব্যবসায় লাটে উঠতো। চলে আসুন।

বুঝলাম ক্ষ্যাপা লোকটা যখন গোঁ ধরেছে তখন যেতেই হবে। পরের দিন পৌঁছালাম জেনেভা। প্রভাতদার কথার ওপর বিশ্বাস করে আতিক এয়ারপোর্টে আসতে পারবে কিনা সেটা আতিকের সাথে কনফার্ম করতে ভুলেই গিয়েছি। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আতিক কে খুঁজে চলেছি আর প্রভাতদার চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার শুরু করবো কিনা ভাবতে না ভাবতেই আতিকের ডাক শুনতে পেলাম। আতিকের এবারের হাসিটাকে আরও মিষ্টি মনে হল।

আতিকের সাথে প্রভাতদার বাড়িতে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা। প্রভাতদা বাসায় নেই। শুন্য বাসা তালা দেয়া। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে প্রভাতদার বিশাল বাগানের মাঝে রাখা কাঠের গুড়িতে বসতে বসতে আতিক সার্নে ফোন দিয়ে দাদার সাথে কথা বলে ফোন রেখে আমাকে বললো,
-পাগল মানুষটা এখনো সার্নে। বললো, এক্ষুণি আসছে। তারমানে প্রায় ঘন্টা খানেক লাগবে। তুমি খুব টায়ার্ড না হলে এখানেও বসা যেতে পারে আবার যদি চাও পাশেই কফিশপ আছে, চল এককাপ কফি খেয়ে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দেই।

আমি বললাম,
-আমার কফিতে কোন সমস্যা নেই।

উঠে অলস ভঙ্গিতে দুই ভাই বাগান পেরিয়ে কেবল গাড়ির কাছে গিয়েছি, বাড়ির ভেতর থেকে হাসতে হাসতে প্রভাতদা বেড়িয়ে এসে বললেন,
-বললাম এক্ষুণি আসছি আর আপনারা চলে যাচ্ছেন।

আতিক ঘুড়ে অবাক বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে রইলো প্রভাতদার দিকে, ওর পা যেন আটকে গিয়েছে মাটির সাথে। আমারই প্রথম ঘোর কাটলো, হাসতে হাসতে প্রভাতদার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম,
-তাহলে ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশনই শুধু নয় একেবারে আস্তো মানুষ ট্র্যান্সপোর্টেশন শুরু করে দিয়েছেন। কোন পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন? এক্সাক্ট জিপিএস লোকেশনের এক্সাক্ট ফ্রিকোয়েন্সী নাকি রিসিভার?

প্রভাতদা একেবারে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,
-বাহ, ঠিকই ধরে ফেলেছেন, রিসিভারই ব্যাবহার করেছি। চলে আসুন সার্নে, আমাদের টীমের সাথে কাজ করবেন।
আমি বললাম,
-না দাদা, আমার বিজ্ঞান দিয়ে কাজ নেই, আমি আছি আমার মত, যা আছি ভালই আছি। রিসিভারটা বাসার কোথায় রেখেছেন, দেখাবেন তো আমাদের?
দাদা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,
-অবশ্যই দেখবেন।
আমি বললাম,
-আচ্ছা দাদা, আমাকে বলুনতো, সেদিন আমরা সার্ন থেকে বেরিয়ে আসবার কয়েক ঘন্টা পর কি আপনি আবার যন্ত্রের ভেতরে ঢুকেছিলেন?

আমাদের উচ্ছাস, আমাদের কথা-বার্তা আতিকের চতুর্মাত্রিক বোধগম্যতার বাইরে চলে গিয়েছে, কিছুই বুঝতে পারার কোন কারণ নেই। একবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে একবার প্রভাতদার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। দাদা উত্তর দিলেন,
-হ্যা, ঠিকই ধরেছেন। প্রথমে আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন সল্ভ করলাম। তারপর ভাবলাম, দুটো কারণে আমার এক্ষুণি যন্ত্রটিতে ওঠা দরকার,
১) আপনাকে আমার এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট থেকে মুক্তি দেয়া এবং
২) যেহেতু আপনার দেয়া প্রবাবিলিটিকে অংক সমর্থন করছে, সুতরাং, যন্ত্রটির সার্বজনীন উপযোগীতা নিশ্চিত করার স্বার্থে কোন একটা "অন্তর্বোধ" শুন্য প্রানীকে যন্ত্রটি থেকে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। আমাদের নতুন প্রাপ্ত ম্যাথ রেজাল্ট অনুযায়ী যন্ত্রের সেটিংস কিছু পরিবর্তন করে, একটা গিনিপিগ সাথে নিয়ে উঠে বসলাম যন্ত্রে। ব্যাটা গিনিপিগটাকে মানুষ প্রায় বানিয়েই ফেলেছিলাম, কথাও বলা শুরু করেছিল আমার সাথে। সুকুমার রায়ের কবিতা পর্যন্ত শোনালাম,
"ভয় পেয়োনা ভয় পেয়োনা
তোমার আমি মারবো না...."।
কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে, সে জীবিত আছে। আসলে সে তো আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না, আমার স্পর্শও পাচ্ছে না। ভয়েই মারা গেল বেচারা। অন্তর্বোধ শুন্য প্রানীর ট্র্যান্সপোর্টেশনে এখনো বহু জটিলতা রয়েছে এবং এই কারণেই দুর্ঘটনা মুক্ত সার্বজনীন ব্যবহার শুরু করতে এখনো অনেক বাকি।

আমি বললাম,
-মানুষের জন্য হয়তো যন্ত্রটিকে নিয়ে আপনাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে কিন্তু বস্তু ট্র্যান্সপোর্টেশনের জন্য তো আপনারা রীতিমতো রেডি। আচ্ছা, বলুন তো, ঐ যে যন্ত্রের সেই যন্ত্রণাময় মাঝের সময়টুকুতে, যে "বোধ" আর "অন্তর্বোধ" এর দ্বন্দ্বের কারণে এতো ঝামেলা, সেই দ্বন্দ্ব বা সময়টা কমাবার জন্য কোন ম্যাথমেটিকাল সাপোর্ট খুঁজে পেয়েছেন কি আপনারা?

প্রভাত দা বললেন,
-সেটা পেয়ে গেলে তো হয়েই গিয়েছিল।
আমি বললাম,
-ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পারিয়ে দিয়ে তারপর যন্ত্রে উঠিয়ে দিন।

প্রভাতদা এবার খুব জোড়ে হেসে উঠে বললেন,
-একবার ঝড়ে বক পরেছে, আবার বক ফেলতে চাইলে চলুন যন্ত্রে উঠি আমরা দুজন।
আমি বললাম,
-ঐ কর্ম আমার জন্য নয়। কিন্তু আমি খুব কি হাস্যকর কথা বলে ফেলেছি?

দাদা বললেন,
-হ্যা, কিছুটা তো বলেইছেন। আপনার জানা থাকবার কথা যে, ঘুমের মাঝেও মানুষের "কন্সাস" এবং "সাবকন্সাস" মাইন্ড প্রায় পুরো দমেই কাজ করে। সে জন্যই তো আপনাকে বলেছিলাম, ঘুম আর মৃত্যুর পার্থক্য যোজন যোজন মাইলের।

আমার নিজস্ব ভাবনা আর গিলগামেশের লেখকের ভাবনাকে মিলিয়ে ফেলা প্রভাতদার এসব খোঁচা গায়ে না লাগিয়ে বললাম,
-আমার একটা দাবী আছে আপনার কাছে। বারেবারে আমিই জেনেভাতে কফি খেতে আসবো কেন? এখন তো আপনি ইচ্ছে করলেই মুহূর্তের মাঝে ঢাকা চলে আসতে পারেন আমার বাড়িতে। রিসিভারটা বড় কিছু না হলে আমায় একটা দিয়ে দিন, চলে আসবেন ঢাকায় আমার বাড়িতে যখন ইচ্ছে, সিলেটের বাগানের খাঁটি এক কাপ চা খাওয়াবো।

দাদা বললেন,
-রিসিভার তো সমস্যা নয়, সমস্যা হল বস্তুকে পাঠাবার বিশাল এবং জটিল যন্ত্রটা, ওটার জন্য তো বাংলাদেশেও একটা সার্ন তৈরী করতে হবে। নইলে, যদি যন্ত্রে চড়ে ঢাকা যাই, ফিরবো কি করে? আপনাদের ইমিগ্রেশন তো আমায় বেঁধে রাখবে এন্ট্রি সীল ছাড়া বাংলাদেশে ঢোকার জন্য।

আরো বহু গল্প, বহু কথার পর প্রভাতদা হঠাৎ পকেট থেকে একটা খাম বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললেন,
-এই খামটি প্লেনে ওঠার আগে খুলবেন না। এটা আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটা গিফট। কয়েকটি কথা আপনাকে বলে রাখি। আমরা যে ফিল্ডটি তৈরী করেছি সেই ফিল্ডের সর্বশেষ ইকুয়েশন বলছে, আমরা যে ছয়টি সম্ভবনার কথা আলাপ করেছিলাম, এগুলোর সবগুলো তো ঘটছেই, এখন আমরা প্রায় নিশ্চিত যে, চতুর্মাত্রিক জগতের মৃত্যুর ডেফিনেশন অনুযায়ী মৃত্যুর বিষয়টিকেও একেবারে ফেলে দেয়া সম্ভব না। আবার অন্যদিকে ম্যাথম্যাটিকালি টাইম ডাইলেশন ফ্যাক্টরকে আমরা যদি গননায় ধরি তবে মাল্টি ইউনিভার্স বা প্যারালাল ইউনিভার্সের থিয়োরীকেও নিশ্চিত করতে পারছি না।

আমার কান দিয়ে তখন কোন কথা আর যাচ্ছে না। একটা খাম আমাকে গিফট করার মানে কি সেটাই শুধু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আর মনে হচ্ছে কখন প্লেনে চড়বো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠবার সাথে সাথেই আতিকের কথা শুনে বুঝলাম, আগ্রহ শুধু আমার একারই না, তারও আছে। আতিক বললো,
-ইনভেলাপটায় কি আছে দেখো তো।
আমি বললাম,
-ভদ্রলোক এতো করে বললো প্লেনে উঠে খুলবার জন্য, এখন খুললে কেমন দেখাবে।
আতিক বললো,
-সে জন্যই তো বাসায় যাবার আগেই এই গাড়িতেই তোমার ওটা খোলা উচিৎ। প্লেনও একটা বাহন, গাড়িও একটা বাহন, তুমি প্লেনে খুলেছো না গাড়িতে খুলেছো সেটা দাদা জানছে কি করে।

একে তো ছোট ভাই, তার উপর আবার এতো কষ্ট করে সময় নেই অসময় নেই, সব কাজ ফেলে আমাকে এতো সময় দেয়, পরামর্শটা কিছুটা কুপরামর্শের মত মনে হলেও আমার মতামত ও ইচ্ছের সাথে মিলে যাওয়ায় অগ্রহণীয় মনে হলো না। খুলে ফেললাম। দেখি ভেতরে একটা ঢাকা-জেনেভা-ঢাকার টিকেট, সাথে একটা চিরকুটে লেখা,
-আমি ঢাকার ছেলে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছি ততদিন পর্যন্ত ঢাকায় যাবো না যতদিন পর্যন্ত আমি নিশ্চিত না হচ্ছি যে, আমার এক্সপেরিমেন্টের মাঝ দিয়ে আমার পরিবারের সাথে একবার ক্ষণিকের তরে দেখা হ'বার সম্ভবনা নেই। আপনাকে আমি আমার প্রজেক্টের জন্য "পয়মন্ত" মনে করছি, বিজ্ঞানেরও মাঝে

মাঝে ভাগ্যের সহায়তা প্রয়োজন হয়। টিকেটটার এক বছরের ভ্যালিডিটি আছে, আপনার যদি আমার সাথে যন্ত্রে উঠতে আপত্তি না থাকে তবে যখন ইচ্ছে চলে আসবেন।

**বিঃদ্রঃ** আমাদের যন্ত্রটির নাম দিয়েছি "DTM", বা "ডাবল টয়লাইট মেশিন"। সহজ বাংলায় “দুই প্রভাতের যন্ত্র” বললে কেউ কিছু মনে করবে না।

চিঠিটি পড়ার পর চিঠিটি হাতে রেখেই প্রায় মিনিট খানেক হতভম্ব অবস্থায় বসে রইলাম। একি ঝামেলায় পরলামরে বাবা। আবারও উঠতে হবে নাকি ঐ যন্ত্রে! আতিকই প্রথম জিজ্ঞেস করলো,
-প্রভাতদা তোমাকে এই নিয়ে তিনবার টিকেট দিলো কেন কিছু বুঝতে পেরেছো?? ক্ষ্যাপার যে কখন কি মাথায় চাপে।

আতিককে চিরকুটটার বিষয়ে কিছু বললাম না, ভাই আমার শুধু টিকেটের কারণেই হতভম্ব। আতিকের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে DTM চড়বার জন্য ফের জেনেভায় আসবো কিনা সেই বিষয়ে ভাবতে বসলাম। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, এতো তাড়া কিসের, এক বছর সময় তো হাতে আছেই। DT মেশিনে উঠি আর নাই উঠি, প্রভাতদাকে একটা প্রশ্ন করার জন্য হলেও এই এক বছরের মাঝে একবার আসবো। হঠাৎ মনে হল, প্রশ্নটি এখনই করলে সমস্যা কোথায়। আতিককে বললাম,
-আমি তো কাল সকালে বাংলাদেশ চলে যাবো। প্রভাতদাকে নিয়ে একসাথে রাত্রের খাবারটা খেলে কেমন হয়।

আমার বলার মাঝে আতিক এমন কিছু একটা পেলো যাতে সে সাথে সাথেই রাজি হ’য়ে বললো,
-আমার সমস্যা একটাই, আমি তোমাকে বাসায় রেখে ঘন্টা দু’য়েকের জন্য বাইরে যাবো। ফিরে এসে একসাথে ডিনার করতে পারি।

**<u>প্রভাতদার বাড়ির গপ্পো</u>**

আতিক দাদাকে ফোন দিতেই প্রভাতদা পালটা প্রস্তাব করলেন আমাকে প্রভাতদার বাসায় নামিয়ে দেবার জন্য, আতিক ফিরে এলে বাড়ির পাশের রেস্টুরেন্টে আমরা একসাথে ডিনার করবো। আতিক গাড়ি ঘুড়িয়ে প্রভাতদার বাসায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি আর প্রভাতদা এবার আর বাগানে না বসে চলে গেলাম দাদার বাসার ভেতরে। প্রভাতদাই প্রথম প্রশ্ন করলেন,
-কি বিষয়, ফিরে এলেন যে।
আমি বললাম,
-গল্পে গল্পে আপনার রিসিভার যন্ত্রটি দেখা হয় নাই।

দাদা দেখালেন যন্ত্রটি। এমন কিছুই না, একটা প্রায় চারফুট ব্যাসের গোলাকার যন্ত্র। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে, এটা কত বড় এক আবিষ্কার। আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমার মনের প্রশ্নটা করেই ফেললাম,
-ক্ষনিকের তরে অতীতে ফিরে যাবার চেষ্টার নস্টালজিয়াতে ভোগা অথবা তারচেয়েও ক্ষণিকের ভবিষ্যত আনন্দের চাইতে বর্তমানের তরে বর্তমানকে নিয়ে থাকলে সমস্যা কোন যায়গায়।

প্রভাতদা হেসে উত্তর দিলেন,

-তারমানে আপনি প্লেনে উঠবার আগেই ইনভেলপটি খুলেছিলেন।

আমি একটু লজ্জাই পেয়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম,
-ছোট ভাইয়ের প্ররোচনা কিছু তো ছিলই, আমার নিজের কৌতুহলও যে ছিল না সেটা আমি বলবোনা।
দাদা বললেন,
-ভালই হয়েছে। ওটা খোলার কারণে আবার তো ফিরে এলেন। আমারও ইচ্ছে ছিল আপনাকে এবারে সব বুঝিয়ে বলার। এরপর আপনি চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমি বললাম,
-DTM নিয়ে আমার নিজস্ব কোন ভয় বা আবেগ নেই। আপনি যদি বলেন তাহলে আজই যেতে পারি।
দাদা বললেন,
-তাড়াহুড়োর কিছু নেই। যন্ত্রটি নিয়ে আমাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে, প্রচুর সময় লাগবে। আগে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলি। তারও আগে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে নেই। আমার বাংলাদেশে না যাবার সিদ্ধান্তের কারণ, আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান এবং আমার নিকট আত্নীয়-স্বজন কেউ এই বিশ্বে নেই। আমার অতীতে ফিরে যাবার ইচ্ছের সাথে নস্টালজিয়ার সম্পর্ক কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু কোন সুখ বা দুঃখ লুকিয়ে নেই। তবে আমার ধারনা মতে, স্মৃতি শুধু মানুষের জন্য তৈরী করা সৃষ্টিকর্তার এক অপুর্ব অবদান এবং DTM দিয়ে সেই স্মৃতির কাছে যাবার একটা সম্ভবনা যখন তৈরী হয়েছে তখন হয়তো সেটাও সৃষ্টিকর্তারই ইচ্ছে।

আমি বললাম,
-স্মৃতি কি শুধু মানুষের জন্যই তৈরী করা হয়েছে বলে মনে করেন।

উনি বললেন,
-বিতর্কিত বিষয়। এখানেই আপনার উল্লেখ করা গিলগামেশের কোটেশনটিকে আমার মনে ধরেছে। ওখানে মানুষের সকল “রস” বা আবেগকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভয় দিয়ে। সেই ভয় নামের আবেগকে পাশবিক স্তরের আবেগ বলা যায়। অন্যান্য প্রানীর স্মৃতি ধারন ক্ষমতা যতটুকুই থাকুকনা কেন, বেশীর ভাগ প্রানীর স্মৃতিতে সাময়িক ভাবে “ভয়” ও "কাম রস" ছাড়া অন্য কোন রসের প্রাধান্য নেই বললেই চলে। যে কারণে একটা হরিন কে যখন একটি বাঘ তাড়া করে তখন হরিন জীবন ভয়ে পালালেও, তাড়া শেষ হবার পর পরই ভুলে যায় সেই অতীত এবং নিশ্চিন্ত মনে আবার তার নিজ জীবনে ফিরে যায়। পশুত্ব এবং মনুষত্বের পার্থক্য এখানেই।

আমি বললাম,
-এটা তো মানুষের জন্যও প্রযোজ্য। মানুষের মাঝেও পশুত্ব এবং মনুষত্ব একই সাথে বিরাজমান এবং মানুষের স্মৃতিও একেবারে ক্ষণিকের না হলেও অসীম সময়ের নয়। যে কারণেই মানুষ এগিয়ে যেতে পারে। এটা যদি না হ’ত তবে মানুষ তার আবেগের চাপেই মারা যেত।

প্রভাতদা বললেন,
-হ্যা প্রযোজ্য এবং এটাও ঠিক যে সেই স্মৃতি সাময়িক নয় আবার চিরস্থায়ীও কিছু নয়। এজন্যই ম্যাকায়াভেলির কোটেশনটি আমার প্রিয়, “মানুষ অতীতকে সহজেই ভুলে যায় এবং বর্তমানকে নিয়ে থাকতেই বেশী পছন্দ করে।"

আমি বললাম,
-তাহলে এই একমাত্র স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে পশুত্ব এবং মনুষত্বকে আপনি ডিফাইন করছেন কিভাবে?

প্রভাতদা মনে হল কিছুটা বিরক্ত, বললেন,
-আল্লা", "পরমাত্মা", "রুহুল্লাহ", "অভিজ্ঞতা ও ভাবনার বিশুদ্ধতা" ইত্যাদি সাবজেক্টের ফিলসফিকাল বিষদ ব্যাখ্যা আমাদের "ডিটিএম" বিষয়ক আলোচনায় অপ্রয়োজনীয়। একাত্মবাদ সম্পর্কিত যেটুকু প্রয়োজন বলে আমি মনে করি সেটুকুই বলছি। এরপর আর এবিষয়ক কোন আলোচনা নয়। ফিরে যাই আমরা আবার "বোধ" ও "অন্তর্বোধ"এর কাছে। চতুর্মাত্রিক ব্যাখ্যার "বোধ" সব সময়ই পশুত্ব ধারন করে কিন্তু...

দাদাকে এবার আমি আক্ষরিক অর্থেই হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললাম,
-একটু থামুন। আপনার পুরো তত্বটাকেই আপনি দাঁড় করিয়েছেন "বোধ" এবং "অন্তর্বোধ"এর উপর ভিত্তি করে। আপনি বলছেন, প্রানী মাত্রেই প্রজাতিভেদে বিভিন্ন মাত্রায় "বোধ" এবং "অন্তর্বোধ" আছে এবং জড় পদার্থেরও প্রকার ভেদে বিভিন্ন মাত্রায় শুধু মাত্র "বোধ" আছে। আবার বলছেন "অন্তর্বোধ" কে "বোধ" না বোঝাতে পারলে প্রানীর মৃত্যু ঘটবে না। আপনি তাহলে "বোধ" এবং "অন্তর্বোধ"কে ডিফাইন করছেন কিভাবে??

আমার এই প্রশ্নে দাদাকে এই প্রথমবারের মত কিছুটা হলেও অপ্রস্তুত মনে হল। বেশ কয়েক সেকেন্ড ভেবে তারপর বলা শুরু করলেন,
-জটিল প্রশ্ন গুলো খুব সহজ ভাবে আপনার মাথায় আসে। এই বিশাল জটিল প্রশ্নের উত্তরটাও যে জটিল হবে এবং আপনার বোধগম্যতার বাইরে চলে যাবে সেটা নিয়ে আপনার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবার কথা নয়। তারপরও প্রাথমিক ভাবে বলতে পারি, বিষয়টির তিনটি আসপেক্ট আছে।
১) বায়োলজিক্যাল বা নিউরো পয়েন্ট অব ভিউ সম্পর্কে আমরা আগেই আলাপ করেছি। ব্রেইনের বাম অংশ, যেটা যুক্তি দিয়ে পরিচালিত, যেখানে আমাদের মহাজাগতিক চতুর্মাত্রিক আইন গুলোকে ব্যাখ্যা দিয়ে রাখা হয়েছে, সেটাকে আমরা "বোধ" বলছি। আর ডান দিকের অংশ, যে অংশটাকে বলা হ'য়ে থাকে বাঁধনহারা ক্রিয়েটিভিটির অংশ, সেটাকে আমরা "অন্তর্বোধ" বলছি।
২) ফিজিক্স পয়েন্ট অব ভিউ আমার সাবজেক্ট। সে অনুযায়ী আমি আপনাকে বিশাল সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দিয়ে না বুঝিয়ে সহজ করে বলি, "বোধ" পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন মাত্রার ওসিলেশন বা কম্পনের মাঝ দিয়ে, অন্যদিকে "অন্তর্বোধ"এর ডেফিনেশন আছে আলোর গতি, আলোর স্পেকট্রাম ও আলোর ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্যের মাঝে।
৩) ম্যাথম্যাটিক্যাল পয়েন্ট অব ভিউয়ের জটিল ইকুয়েশনের মাঝে তো আপনি যেতেই আগ্রহী নন, আপনাকে ওখানে নেবোও না। তবে এটুকু আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এবিষয়ক অসম্পূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল সাপোর্ট যতটুকু আছে সেটুকু ফিজিক্সকে সমর্থন করে।

আমি বললাম,
-আপনার তত্বের জটিলতাপূর্ণ অংশ গুলো নিয়ে আসলেই মাথাই ঘামাতে চাইছিনা। ফিরে চলুন আবার "বোধ", "অন্তর্বোধ" এবং পশুত্ব নিয়ে যেটা বলছিলেন।

প্রভাতদা বললেন,
-হ্যা, যা বলছিলাম। মানুষের “বোধ” সব সময়ই পশুত্ব ধারন করে কিন্তু মোরাল ও ইথিক্স দিয়ে পরিচালিত "অন্তর্বোধ"এ রাজত্ব করে মনুষত্ব। সাধারণ একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একজন সিরিয়াল কিলার যখন খুন করতে থাকে তখন তার "অন্তর্বোধ" তার জন্য মৃত প্রায়। একটি সমাজে যখন ধর্ষন, খুন সহ বিভিন্ন অমানবিক কর্ম বেড়ে যাবে তখনই বুঝবেন যে সমাজের অন্তর্বোধ অবশ বা মৃত প্রায়। শব্দটি আরেকবার বলি, “মৃত প্রায়”, কারণ, সম্পুর্ন মৃত বললে প্রানীর সাথে জড় পদার্থের কোন পার্থক্য থাকবে না। যে কারণে চরম নির্বোধ প্রানীটির মাঝেও কিছুটা হলেও "অন্তর্বোধ" কাজ করে। এটাই প্যানসাইকিজম থিয়োরী। আমাদের “ডিটি” মেশিনের জন্য প্রয়োজন উন্নত "অন্তর্বোধ"এর মনুষত্বকে।

আমি বললাম,
-আপনি যদি বিষয়টিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেন তাহলে তো বলা যায়, পশুত্ব প্রাথমিক স্তরের রসবোধ, যেখান থেকে বিবর্তিত হ’য়ে উন্নত মনুষত্ব স্তরের সৃষ্টি। তাহলে তো আপনি আরেক অর্থে ডারউইনের ইভলিউশন থিয়োরী মেনে নিয়েছেন।
প্রভাতদা বললেন,
-কোন থিয়োরীকেই একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব না। প্রতিটি তত্বই বহু পর্যবেক্ষন এবং চিন্তার ফসল।
আমি বললাম,
-তাহলে যে আপনি বলেছিলেন, “বিজ্ঞান কখনোই ধর্মকে অতিক্রম করতে পারেনা”, সেটার কি হবে।

প্রভাতদা বললেন,
-ডারউইন মহোদয় তার তত্বে সৃষ্টিকর্তার ব্যাখ্যা করেছেন কি। মহাজাগতিক সময়ের হিসেব দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সময়কে মাপছেন কেন? “মনু”ই বলেন আর “আদম”ই বলেন, সৃষ্টিকর্তার শেষ সৃষ্টির সাথে আগের সৃষ্টি সমুহের এই মহাজাগতিক সময়ের হিসেবের পার্থক্য কোটি বছর যে নয়, সেই সিদ্ধান্ত আপনি নিচ্ছেন কিভাবে এবং সেই ইভলিউশনকে এই বিশ্বেই ঘটাতে হবে সেটাই বা ভাবছেন কেন? সৃষ্টিকর্তার এক মুহুর্ত চতুর্মাত্রিক পৃথিবীর হাজার বা লক্ষ কোটি বছরের সমান হলেও আমি অন্তত অবাক হব না।

আতিক কখন ঘরের ভেতরে ঢুকেছে আমরা দু’জনে সেটা খেয়ালই করিনি। হাসতে হাসতে বললো,
-আমাকে বাদ দিয়ে আমার প্রিয় সাবজেক্ট নিয়ে তোমরা আলাপ করছো সেটা আমি মেনে নিতে পারি না। ডারউইনের একটা কোটেশন না দিয়ে পারছিনা, “একটা আমেরিকান বানর যদি একবার ব্র্যান্ডি খেয়ে মাতাল হয় তবে সে আর কখনোই ব্র্যান্ডি ছুঁয়েও দেখবেনা, সেই হিসেবে বানর গুলো বেশীর ভাগ মানুষের চেয়ে জ্ঞানী”।

প্রভাতদা হেসে দিয়ে বললেন,
-এই যে এসে গিয়েছে কোটেশন বিশেষজ্ঞ। ডারউইনের আরেকটি কোটেশন তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই “নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন একটি প্রানী তার অতীত স্মৃতির কর্ম ও অভিপ্রায়ের প্রতিবিম্ব দিয়ে পরিচালিত হয়, যে স্মৃতির কিছু অংশ সে গ্রহন করে এবং বাকিটুকু ফেলে দেয়”। এটুকু তো স্বীকার করবে যে, প্রানী জগতে একমাত্র মানুষই নীতি এবং নৈতিকতা দিয়ে পরিচালিত হয়।

আতিক দুই হাত উপরে তুলে বললো,

-দাদা, এটা আপনার বাড়াবাড়ি। সাইন্স নিয়ে আপনার উপর আমি কখনও মাতব্বরী করার চেষ্টা করিনা। ফিলসফি নিয়ে আমার ওপর মাতব্বরী করার আপনার অপচেষ্টা আমাকে আপনার বিরুদ্ধে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করছে। যাক, আপনাদের আলোচনায় ব্যাঘাত না ঘটাবার জন্য আমি ডিনার নিয়ে এসেছি। আপনারা গল্প করতে থাকুন আমি প্লেট নিয়ে আসি কয়েকটা।

আতিকের কাজে কর্মে বুঝলাম যে, সে মাঝে মাঝেই প্রভাতদার সাথে এই ধরনের আড্ডায় অভ্যস্ত, এই বাড়ির সব তার মুখস্ত। প্লেট, গ্লাস সব সুন্দর ভাবে সাজাতে লেগে গেল। প্রভাতদা সরাসরি ডিটিএম প্রসঙ্গে চলে গেলেন, বললেন,
-আমরা যে ছয়টি প্রবাবিলিটির কথা বলেছিলাম সেটা আপনার মনে আছে কি?

আমি বললাম,
-১) ব্ল্যাকহোল
২) টাইম মেশিন
৩) কোয়ান্টাম জগত
৪) মৃত অবস্থা
৫) ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশন
প্রভাতদা বললেন,
-হ্যা, ঠিক আছে। আপনাকে তো আগেই বলেছি, ছয়টি প্রবাবিলিটিই ডিটিএমে কাজ করে চলেছে বলে ম্যাথেমেটিকাল ইকুয়েশন প্রমান করে। সাইন্টিফিক জটিলতা ছাড়া ব্ল্যাকহোলের কাজ সম্পর্কে আগেই বলেছি ব্ল্যাকহোলের বিশাল ভরের কারণে আলোকরশ্মি পর্যন্ত সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা। সময়ের মূল পরিমাপক যেহেতু আলোকরশ্মি, সেহেতু, ব্ল্যাকহোলের মত বিশাল ভর সম্পন্ন একটি ক্ষেত্রের দিকে যখন যেতে থাকবেন তখন যতই আপনার ও ব্ল্যাকহোলের মাঝে দুরত্ব বা "স্থান" সূচক কমতে থাকবে ততই "সময়" নামের সূচকটি ব্ল্যাকহোলের দিকে বেঁকে যেতে থাকবে। যখন ব্ল্যাকহোলের একদম কিনারায় অর্থাৎ "ইভেন্ট হরাইজোনে" চলে যাবেন, তখন "স্থান" সুচক শুন্য হয়ে যাচ্ছে এবং "সময়" সূচকও "স্থান" সূচকের একই লাইনে চলে যাছে। অর্থাৎ, "সময়"ই তখন "স্থান" এবং ভাইস ভার্সা।

আমি বললাম,
এসব জটিল বিষয় আমার না বুঝলেও চলবে। আমার শুধু জানা প্রয়োজন "ডিটিএম" টাইম ট্রাভেল করতে পারবে কিনা।

প্রভাতদা বললেন,
-অবশ্যই পারবে। আমরা তো ব্ল্যাকহোলের ভেতরে এখনো যাইনি। ব্ল্যাকহোলের ঠিক বাইরে অবস্থান নেয়ার কারণে "সময়" সূচকটি আমাদের "স্থান" সূচকের একই সমান্তরালে এবং সেই কারণেই চতুর্মাত্রিক মাত্রাগুলো সেখানে অচল। কিন্ত ইলেকট্রিকাল চার্জবিহীন এবং ঘুর্নন ছাড়া কোন ব্ল্যাকহোল যদি তৈরী করা যায় তাহলে সেই ব্ল্যাকহোলের ঠিক ভেতরে যাবার পর অংকের হিসেবে সব আগের মতই থাকবে কিন্ত ব্ল্যাকহোলের "ইভেন্ট হরাইজোনের" বাইরে থেকে আসা আলোর খানিকটা অতীত আমরা দেখতে পাবো, অর্থাৎ, অতীত দেখতে পাবো। অবশ্য তার পরপরই আমরা যখন ব্ল্যাকহোলের আরও গভীরে চলে যাবো তখন সময়ের কাটা পেছনে ঘোরা শুরু করার কথা এবং তখন হয়তো বর্তমান, ভবিষ্যত, অতীত সহ সব কালই হারিয়ে যাবে। ব্ল্যাকহোল পার হবার পর "ডিটিএম" আমাদের অতীত ও ভবিষ্যত টাইম

ট্রাভেল সম্ভবপর করে তোলা সহ স্পেস ট্রাভেল, মহাজাগতিক ভ্রমন সম্ভব করে তুলবে বলে অন্তত আমি বিশ্বাস করি।

আমি বললাম,
-আপনি তো মাত্র দু'টি প্রবাবিলিটি আলাপ করলেন, বাকি গুলো কি ফেলে দিচ্ছেন?

প্রভাতদা বললেন,
-নাহ, ফেলবো কেন? আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত যে, সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য "ডিটিএম" দিয়ে কোয়ান্টাম ফিল্ড তৈরী ক'রে আবার আমরা ফিরে আসছি এই মহাবিশ্বের প্রচলিত চতুর্মাত্রিক আইনে। যে কারণে রিসিভার বসিয়ে ম্যাটার ট্রান্সপোর্টেশন করতে পেরেছি। আপনাকে তো আগেই বলেছি, ডিটিএম আমাদের "বোধ"এর মৃত্যু ঘটাচ্ছে কিন্তু সময় এখানে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র, যে কারণে "অন্তর্বোধ" পরাজিত হবার আগেই ফিরে আসাতে শক্তিশালী "অন্তর্বোধ"এর অধিকারি "মানুষ" ফিরে আসছে। অন্য প্রানী গুলোর "অন্তর্বোধ" খুব দূর্বল হবার কারণে তারা ফিরতে পারছে না।

আমি বললাম,
-আমরা যদি অতীতে ফিরতেই পারি, কিংবা যদি মহাকাশ বা মহাজাগতিক ভ্রমন করতেই পারি তাহলে এখনো কেন কোন ভবিষ্যতের অথবা অন্য কোন মহাজগতের প্রানীকে এই পৃথিবীতে দেখতে পাইনি।

প্রভাতদা বললেন,
-ব্যাখ্যাটিকে ছোট্ট করে বলি।
১) আমরা এখনো নিশ্চিত নই আমরা অতীতে ফিরতে পারবো এবং অতীতে ফিরলেও কতটা অতীতে ফিরতে পারবো।
২) আমরা তো এখনো আমাদের সেই ভবিষ্যতেই পৌঁছাইনি, যে ভবিষ্যতে টাইম মেশিন আবিষ্কৃত হ'য়েছে। গতকালের মানুষের পক্ষে তো আজকের মানুষকে দেখা সম্ভব নয়।
৩) এমনও হ'তে পারে যে, ভবিষ্যতের মানুষ গুলো অতীতে ফিরলেও অতীতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব না, শুধুই অবলোকন সম্ভব।
৪) যোগাযোগ সম্ভব হলেও হয়তো সেটা কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেমেন্টের মাধ্যমে শুধু খুবই প্রিয় মানুষের সাথে সম্ভব।
৫) অতীত ভ্রমনের মতই আমরা এখনো নিশ্চিত নই যে, ভবিষ্যতে গেলেও আমরা শুধুই দেখবো-শুনবো, নাকি উপস্থিত হ'য়ে তাদের সাথে কোন এক মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবো

-এবার আসা যাক মহাকাশ অথবা মহাজাগতিক ভ্রমন প্রসঙ্গে,
১) আপনাকে আগেই বলেছি, আলোর গতির চেয়েও বেশী গতিতে মহাকাশ ছড়িয়ে পরছে। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রও আমাদের কাছ থেকে প্রায় সারে চার আলোকবর্ষ দূরে এবং নিকটতম গ্যালেক্সি পঁচিশ হাজার আলোক বর্ষ দূরে। হয়তো আমাদের এই গ্যালেক্সিতে আমাদের চেয়ে উন্নত প্রানের অস্তিত্ব নেই।
২) আলোর গতিতেও যদি আমরা স্পেস ট্রাভেল করি তাহলেও অন্য গ্যালেক্সির কেউ যদি এসেও থাকে, তাহলেও আমাদের পৃথিবীতে প্রানের অস্তিত্ব খুঁজে বের করে আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে আমাদের চতুর্মাত্রিক পৃথিবীর সময়ের হিসেবে পঁচিশ হাজার বছরও লেগে যেতে পারে। আমরা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছি যে, আমাদের বিশ্বে দশ বা বিশ হাজার বছর আগে ভিন গ্রহের মানুষ আসেনি।

৩) অন্য মহাজাগতিক প্রানী যদি এসেও থাকে তাদের নিজস্ব বিশ্বের আইন অনুযায়ী হয়তো তারা আমাদের কাছে অদৃশ্য।
৪)

**<u>আতিকের গপ্পো</u>**

আতিক টেবিল সাজাচ্ছিল আমাদের পাশেই। বললো,
-টেবিল রেডি, খেয়ে নেয়া যাক।

খেতে বসেই আতিক বললো,
-দাদা, আপনার কথা গুলোর ক্ষন্ডিত অংশ আমি অযাচিত ভাবে শুনে যতটুকু বুঝতে পারলাম, আপনারা একটা ব্যাখ্যাতীত যন্ত্র তৈরী করেছেন যেটার নাম দিয়েছেন "ডিটিএম"। ঐ যন্ত্রে চড়ে আপনারা টাইম ট্রাভেল, স্পেস ট্রাভেল ইত্যাদির স্বপ্ন দেখছেন। এসব জটিল সাইন্টিফিক কথা বার্তা আমার বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ করার মানে কি সেটা বুঝলাম না।
প্রভাতদা বললেন,
-প্রথমত, আমি এবং তোমার ভাই গতবার যন্ত্রটিতে চড়েছি এবং সেই প্রেক্ষিতে এই যন্ত্র দিয়ে "ম্যাটার ট্র্যান্সপোর্টেশন" সম্ভব বলে প্রমান করেছি। আজ তুমিও এক সেকেন্ডের মধ্যে সার্ন থেকে আমাকে আসতে দেখেছো, ওটা ঐ যন্ত্রের কারণেই ঘটেছে। এখন আমরা যন্ত্রটির আপগ্রেডেড ভার্সন তৈরী করছি, যেটাতে করে অতীতে যাওয়াও সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং তোমার ভাইয়ের যন্ত্রটির প্রতি আগ্রহ আছে।
আতিক বললো,
-আইন্সটাইনের থিয়োরী অনুযায়ী আপনারা কিছুতেই অতীতে ফিরতে পারেন না।

প্রভাতদা বললেন,
-আইন-স্টাইন কিছু বলা মানেই সেটাই আইন নয়। উনি শুধুই তার সময়ের প্রচলিত সাম্ভাব্য থিয়োরী গুলোকে এক সূতোয় গেঁথে একটি সুন্দর ফুলের ডালি সাজিয়েছিলেন। যথেষ্ঠ তথ্য এবং প্রমান না থাকায় স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ক তার থিয়োরী কে এতোদিনের বিজ্ঞান অস্বীকার করতে পারেনি। উনি পছন্দ করতেন না বলে তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স অশুদ্ধ হ'য়ে যায়নি। সাইন্সের অগ্রগতি এখন এমন পর্যায়ে আছে যে, ম্যাথেমেটিক্যালি না হোক, অন্তত থিয়োরী অব প্রবাবিলিটি দিয়ে বলতে পারি, অতীত একেবারে অধরা কোন সাবজেক্ট নয়। তোমার ভাইকে এতো জটিল বিষয় বুঝাতে চাইনি ইচ্ছে করেই, তুমি হয়তো আমাদের থিয়োরী কিছুটা বুঝবে।

কথাটা বলেই দাদা একটা কাগজ এবং কলম নিয়ে আতিককে সব বোঝাতে শুরু করলেন। আমার ওদিকে কোন আগ্রহ না থাকলেও কিছুক্ষণ শুধুই চেয়ে থাকলাম, দেখলাম কিন্তু বুঝলাম না কিছুই। আমি ভেবে চলেছি কতদূর অতীতে আমরা যেতে পারবো, এক বছর, দশ বছর। বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যুর সময়ে কি যেতে পারবো? আমরা কি শুধুই অতীত বা ভবিষ্যত দেখতে পাবো নাকি ঐ সময়ে উপস্থিত হতে পারবো? ঐ সময়ে উপস্থিত হ'লে ঐ সময়ের “আমি” তো দু'টি হ'য়ে যাবে। সেটার সমাধান কি হ'তে পারে? আমি জানি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রভাতদা হয় বলবেন আমরা এখনো জানিনা, নয়তো কিছু জটিল অংকের ইকুয়েশন বোঝাবার চেষ্টা করবেন। আমার হঠাৎ মনে এলো, অতীতে ফেরার নস্টালজিয়ায় খেয়ালই করিনি যে, মহাজাগতিক ভ্রমন কিভাবে সম্ভব সেটা সম্পর্কে প্রভাতদা কিছুই

বলেননি। আমি এলোপাথারি ভাবনার জগত থেকে ফিরে এসে দেখি আতিক তখনও মনযোগ দিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে সব আঁকাবুকা আর অংক বুঝেই চলেছে। দাদা বলছেন,

-আমাদের প্রয়োজন শুধু আমাদের ফিল্ডটিকে আরও শক্তিশালি ক'রে আমাদের যন্ত্রের গোলকটিকে ঘিরে ফেলা এবং ফিল্ডটির স্থায়ীত্ব নুন্যতম এক সেকেন্ডে আনা। সেই সমস্যার ম্যাথেমেটিকাল সমাধান আমরা করে ফেলেছি, আগামী কিছুদিনের মধ্যে প্র্যাকটিকাল ইমপ্লিমেন্টেশনের কাজও আমরা শেষ করে ফেলবো বলে আশা করছি। সমস্যা হবে একটাই, বস্তু বা অন্য কোন প্রানী গুলো যখন পাঠাবো, আমাদের আগের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতবাণী করেই দিতে পারি যে, ওগুলো ফেরৎ আসলেও মানুষ ছাড়া অন্য প্রানীগুলো জীবিত অবস্থায় ফেরৎ আসবার কোন সম্ভবনাই নেই।
আতিক বললো,
-আমার তো মনে হচ্ছে আপনারা ব্ল্যাকহোলে ঢোকার পর সেটার প্রচন্ড ভরের কারণে আর ফিরতেই পারবেন না।
আমি বললাম,
-বাদ দিন তো ওসব। আপনি কিন্ত এখনো বলেননি কিভাবে আপনি এই যন্ত্র দিয়ে স্পেস ট্রাভেল অথবা মহাজাগতিক ভ্রমন করবার আশা করছেন।

প্রভাতদা বললেন,
-খুব সহজ, এপর্যন্ত এই মহাবিশ্বে যতগুলো ব্ল্যাকহোল দেখা গিয়েছে তার সব গুলোর পেছনে রয়েছে তীব্র আলোকচ্ছটা। অনেকটা পূর্ণ সূর্যগহনের পর গ্রহনের চারপাশে যে আলোকচ্ছটা দেখা যায় সেরকম।
সম্ভবনা এখানে দুটি,
১) ধারনা করা হ'য়ে থাকে প্রতিটা ব্ল্যাকহোলই আমাদের মহাজগত ছেড়ে অন্য কোন ডাইমেনশনের মহাজগত বা আমারদের মহাবিশ্বের গ্যালাকটিক এবং/অথবা নক্ষত্র ভ্রমনের শর্টকাট দরোজা।
ক) হয়তো ঐ আলোকচ্ছটা হয়তো অন্য মহাজগতের সম্মিলিত অবস্থান থেকে আসছে।
খ) এমনও হ'তে পারে, ব্ল্যাকহোল অতিক্রম করলেই আমাদের জন্য আমাদের মহাজগতের গ্যালেক্সি থেকে গ্যালাক্সি নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে ঘুরে বেড়ানো অথবা অন্য কোন ডাইমেনশনের মহাজগতে অথবা টাইম ট্রাভেলে যাওয়ায় কোন সমস্যাই থাকবেনা।

আতিক বললো,
-আপনি সব সম্ভবনার কথা বলছেন, নিশ্চিত কিছুই না। আপনারা মানে সাইন্টিস্টরা এখনো যেখানে স্ট্রিং থিয়োরী, মাল্টি বা প্যারালাল ইউনিভার্স, ডার্ক ম্যাটার বা এনার্জি তো দূরের কথা মাধ্যাকর্ষণতত্বই প্রমান করতে পারেননি, সেখানে এইসব প্রবাবিলিটির মধ্যে আমার ভাইকে জড়াবার কোন মানেই হয় না।

প্রভাতদা খুব গম্ভীর ভাবে বললেন,
-তোমার বড় ভাই যখন যন্ত্রটিতে চড়েছিল তখনও টেলিপোর্টেশনের প্রবাবিলিটি আমাদের মাথাতেই ছিল না। ট্রায়াল এবং এরোরের ভিত্তিতেই সাইন্স নিশ্চিত প্রমান তৈরী করে ।

আতিক চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ সটান উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করলো দরোজার দিকে, বললো,

-গল্পে গল্পে সময় কত হয়েছে বুঝিইনি। ভোর পাঁচটা বাজে প্রায়। ভাইয়ের ফ্লাইটের আর মাত্র ঘন্টা চারেক বাকি। এয়ারপোর্টে যেতেও এখান থেকে প্রায় ঘন্টা খানেক সময় লাগবে। আমাদের এক্ষুণি উঠতে হবে।

দাদার কাছ থেকে বিদায় নেবার কোন সুযোগই আতিক দিলনা। আমিও ভাইয়ের পেছনে যেতে যেতে বললাম,
-এক বছরের মধ্যে দেখা হবে দাদা ইনশাআল্লাহ।

আতিক গাড়ি স্টার্ট দিয়েই নিজেকে আমার বড় ভাই বানিয়ে খুব গম্ভীর গলায় বললো,
-গতবার আমি জানতাম না যে, তুমি ঐ পাগলটার সাথে যন্ত্রটায় উঠবে। এবার সব জানার পর আমি তোমাকে কিছুতেই ঐ যন্ত্রে উঠতে দেবোনা।

আমি চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলাম কোন উত্তর না দিয়ে। অনেক্ষণ পর বললাম,
-আজকাল আমি কোন সমস্যায় পরলেই বাবার মত ক'রে ভাবার চেষ্টা করি। ভাবি, বাবা এই পরিস্থিতিতে পরলে কি করতেন। কোন কারণে যদি "ডিটিএম" আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারে তাহলে বর্তমান কিছু সমস্যার উত্তরটা অন্তত জানতে পারবো।

আতিক সাথেসাথেই বেশ উত্তেজিত ভাবে বললো,
-এসব গাঁজাখুরী ভাবনা ছাড়ো তো। গত বিশ বছরে এই বিশ্বের কত পরিবর্তন এসেছে। কোন অদ্ভুত কারণে, সব নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে বাবার সাথে যদি দেখাও হয় তোমার, বাবা তোমাকে সমাধান দেবে কি করে? এটা তোমার বিশ্ব, তোমার সময়, তোমার সমস্যা। সমাধানও তোমাকেই করতে হবে। বাস্তবতা এটাই।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার নিরবতায় আতিকের উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়েছে বোধহয়। খুব ধীর স্থির ভাবেই বললো,
-তুমি যদি সিদ্ধান্ত নাও ঐ এক্সপেরিমেন্টে যাবার তবে আমি তোমাকে আটকাতে পারবো না জানি। তুমি দাদার সাথে যোগাযোগ করে ঠিকই চলে যাবে। আমি তোমাকে শুধু বলবো, এই বয়সে এসব অজানা এডভেঞ্চারে পা বাড়িওনা।

আমিও খুব ঠান্ডা স্বরে বললাম,
-মানুষ সারা জীবন এই বিশ্বে কাটিয়ে দিয়ে, সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েও অজানার ভয়কেই সহজে জয় করতে পারে না। আমি গতবার এই যন্ত্রে চড়ে অজানার ভয়কে জয় করেছি। এবারের অজানাকে জয় করার হাতছানি এড়াতে পারবো কিনা জানি না। সময় তো আছে একবছর, দেখা যাক।

আতিক আর কিছুই বললো না। এয়ারপোর্টে নামবার সময় শুধু বললো,
-যে সিদ্ধান্তই নাও, আমাকে জানিও।
আমি বললাম,
-আমরা প্রতি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছি। কয়েক সেকেন্ড পরেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি এয়ারপোর্টের ডান দিকের দারোজা দিয়ে ঢুকবো নাকি বাম দিকের দরোজা দিয়ে; সেই সিদ্ধান্তই আমি

তোকে এখন দিতে পারবো না। এক বছর পরের সিদ্ধান্ত কিভাবে জানাবো। **শুভ কামনা** রইলো, আমার জন্যও **শুভ কামনা** করিস।

নির্বাক আতিককে ঐ অবস্থাতে রেখেই ফিরে এলাম ঢাকা। আবার কবে দেখা হবে ছোট ভাইটির সাথে, আদৌ দেখা হবে কিনা আর, আমার এখনো জানা নেই।

**উপসংহার**

বাংলাদেশের বর্তমান লেখালেখির জগতের বিশাল একজন "আঁ-তেল"এর কিছু গবেষনা ধর্মী কথাবার্তা পড়ে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হল। উনি ইংরেজী "জেনোসাইড" শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে যারা "গণহত্যা" শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন তাদের বেশ ভালই একহাত নিয়ে বেশ সুন্দর কিছু বচন বয়ান করে বাণী দিয়েছেন। "জেনোসাইড" শব্দটির "ইউএন" সনদের ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমরা কতটাই নির্বোধ।

হইলো না ভেজাল। আমিও তো ৭১'এর "জেনোসাইড" কে বাংলায় গণহত্যাই বলে থাকি। এতো বড় মাপের একজন মানুষ এতো জ্ঞান দিয়েছেন, নিজেকে শুদ্ধ তো করতেই হয়। তাড়াতড়ি গুগুল আন্টি থেকে শুরু করে সব ডিকশনারি নিয়ে বসলাম। কিন্তু সমস্যায় পরলাম, কোথায়ও "জেনোসাইড" শব্দটির বাংলা অর্থ "গণহত্যা" ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। যাক, বাঁচা গেল। আমি ওনার বয়ান অনুযায়ী পাপী হতে পারি, অন্তত জ্ঞানপাপী না। তবে একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় আসলো না, ভদ্রলোকের "ইউএন" সনদের প্রতি যদি এতোটাই আস্থা থেকেই থাকে তাহলে তো আমাদের মত নির্বোধদের মহাপাপী হবার হাত থেকে রেহাই দেবার লক্ষে "বাংলা একাডেমী" কে নির্দেশ দিতেই পারতেন, তোমরা "জেনোসাইড" নামের ইংরেজী শব্দটিকেই বাংলা ভাষায় সংযুক্ত কর। অথবা উনি নিজেই "জেনোসাইড" শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ আবিষ্কার করে ওনার গবেষণা লব্ধ ফলাফল আমাদের জানিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো।

ওনার জ্ঞান আবার কোন কারণে যদি আমাকে ভবিষ্যত অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ওনার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় তো নিলাম কিন্তু তার পরপরই মনে হল, আমার লেখা "টাইরোসিনিক গপ্পো' এর "কারণ" ও "উদ্দেশ্য" সম্বলিত একটা ব্যাখ্যা না দিলে ওটা পড়ার পর, গল্পের দুর্বোধ্যতায় অনেকেই আমাকেও হয়তো “আঁতেল” ("আঁ-তেল" বানাবার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন সেসব অন্তত ঐ লেখাটিতে নেই) শ্রেনীভুক্ত ক'রে ফেলতে পারেন। সে কারণে এবিষয়ক দুয়েকটি কথা বলে রাখা ভাল। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, প্রিকশন ইজ বেটার দ্যান প্রিভেনশন। আর বাংলায় এবিষয়ক প্রবাদটি বহুল প্রচলিত বিধায় উল্লেখ করলাম না।

একটা সাইন্স-ফিকশন ধরনের কল্প কাহিনী লেখার চেষ্টা করতে যেয়ে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছে গল্পটিতে, যেমন, বর্তমান সাইন্স এখন পর্যন্ত এটুকু প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলে, টাইম ট্রাভেল করা গেলেও যেতে পারে কিন্তু কখনোই অতীতমুখী টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। শুধু এই প্রতিষ্ঠিত তত্বকে প্রবাবিলিটির পর্যায়ে আনার চেষ্টায় গল্পের কয়েকটি পাতা ছেড়ে দিতে হয়েছে। "টাইরোসিনিক গপ্পো"তে ফ্রেঞ্জ কাফকার "মেটামরফোসিস" ধরনের একটা কিছু লেখার অপচেষ্টা যে ছিল না সেটা বলা যাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই ওনার সামাজিক স্যাটায়ার, ফিলসফিক্যাল ম্যাচিউরিটি এবং অতিপ্রাকৃত জগত দিয়ে তৈরী করা ফিউশনের ধারে কাছে পৌঁছানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই চেষ্টাও করিনি। তবে ফিলসফি

এবং সাইন্স-ফিকশনের যে ফিউশন তৈরী করবার ইচ্ছে নিয়ে লেখাটি শুরু করেছিলাম, সেটা ততটুকুই করা সম্ভব হয়েছে যতটুকু আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল। চরিত্রের রূপান্তরণ, অর্থাৎ, শুরুতে গল্পটির নায়ক, ভিলেন বা কথক হিসেবে যাকেই মনে করা হোক না কেন, গল্পের শেষে সব চরিত্রকেই ওলট পালট করা গিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

অন্য কেউ যদি এই ধরনের প্যাঁচালো লেখা লেখেন, সেটা পড়তে আমি নিজেই খুব ক্লান্ত বোধ করি। সুতরাং, যারাই কষ্ট করে এই লেখাটি পড়েছেন তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর লেখাটির জটিলতার কারণে কেউ যদি যন্ত্রনাগ্রস্ত হ'য়ে থাকেন তবে তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।

**(সমাপ্ত)**